নীতি-সন্দর্ভ।

শ্রীসতীশচন্দ্র দেব, বি এল্ প্রণীত।

প্রথমসংস্করণ।

শিলচর;

এরিয়েন প্রেসে শ্রীমথুরানাথ চৌধুরিকর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শকাব্দ ১৮৩৫

মূল্য।৵০ ছয় আনা।
বাঁধাই ॥০ আট আনা।

শ্রীশ্রীদুর্গা।

উৎসর্গ-পত্র।

যাঁহার পদপ্রান্তে বসিয়া আমি

মনুষ্যত্বের

প্রথম-উপদেশ লাভ করিয়াছিলাম;

যিনি

বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক্যে

আমার

জীবনের ধ্রুব-তারা;

যিনি

বিষয়ের বিবর্ত্তে থাকিয়াও

যোগীর ন্যায় অ-চঞ্চল;

সেই পিতৃপ্রতীমপিতৃব্য মাননীয়

রায় দুলালচন্দ্র দেব বাহাদুরের চরণে

আমার

এই প্রথম সাহিত্য-লতিকার ক্ষুদ্রকুসুম

উৎসর্গ করিয়া কৃতার্থ

হইলাম।

শ্রীসতীশ।

ভূমিকা।

নীতিসন্দর্ভ আমার প্রিয়বন্ধু সতীশচন্দ্র দেব বি,এল্, মহাশয়ের সরসলেখনীপ্রসূত। সতীশবাবুর বিদ্যাবুদ্ধি, ধর্ম্মভাব, চরিত্রবল ও বঙ্গভাষার লিপিকুশলতার প্রশংসা করা আমার অন্যায়; তিনি আমার পরমসুহৃদ্; কেবল এইমাত্র বলিতে পারি, সাধারণে একবার নীতিসন্দর্ভ পাঠ করিয়া দেখুন, শ্রীভূমি শ্রীহট্টের কত রত্ন উপযুক্ত সুযোগের অভাবে, স্বকীয় জ্ঞানের ভাণ্ডার লুকাইয়া রাখিয়াছে। আমি শ্রদ্ধাভাজন সতীশচন্দ্রকে সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিলাম। আশা করি, শ্রীহট্টবাসী এই প্রবীণলেখকের নবীনগ্রন্থের প্রকৃতমর্য্যাদা রক্ষা করিবেন।

শিলচর,
১লা বৈশাখ;
১৩২০ বঙ্গাব্দ।

শ্রীভুবনমোহন দেবশর্ম্মা।

সূচীপত্র।

বিষয়।	পত্রাঙ্ক।
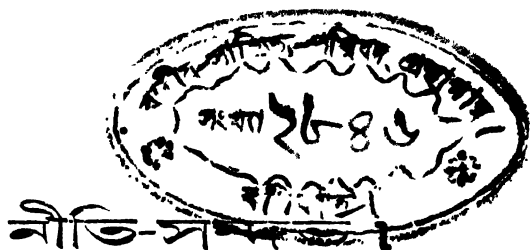
"চরিত্র"।

মানুষের সম্মুখে স্বর্গ ও নরক উভয়ই বিদ্যমান। মানুষ ইচ্ছা করিলে স্বর্গের দেবত্ব লাভ করিতে পারে, ইচ্ছা করিলে নরকের কীট হইতে পারে। ইচ্ছা করিলে আশু প্রীতিকর অথচ পরিণাম-বিরস ভোগলালসার পরিতৃপ্তি সাধন করিয়া নরকে আজীবন অনন্ত ক্লেশ ভোগ করিতে পারে; পক্ষান্তরে সৎপ্রবৃত্তির অনুসরণ করিয়া স্বর্গের বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে পারে। তাই একজন মহাকবি বলিয়া গিয়াছেন,—"অবস্থাবিশেষে মানুষই দেবতা হইতে পারে"। আমাদের পরমপূজনীয় আর্য্য-মহর্ষিগণ বিশুদ্ধচারিত্রের পারাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া এই মহা-বাক্যের যাথার্থ্য সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। চরিত্রই মানুষকে দেবতা ও পশু করে। তুমি চরিত্রবান্ হইতে পারিলে ইহজগতে অক্ষয়কীর্ত্তিস্থাপন ও পরজগতে স্বর্গলাভ করিবে; আর চরিত্রহীন হইলে ইহজগতে অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়া পরজগতে নরক-যন্ত্রণাভোগের অধিকারী হইবে।

শশধর-সুশোভিতা রজনী যেরূপ চিত্ত আকর্ষণ করে, চরিত্রবান্ লোকও সেইরূপ অন্যের চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকেন; পরন্তু চন্দ্রমাবিহীন রজনী যেমন ভীতি-উৎপাদক, চরিত্রবিহীন মানব সেইরূপ অন্যের ভয়ানক। চরিত্রহীন লোকের অশেষ গুণ থাকুক, কিন্তু সেই সমস্ত গুণের আকর্ষণ-কারিণী কোনও শক্তি থাকে না। সুতরাং চরিত্র বিশুদ্ধ হওয়া একান্ত আবশ্যক। ইহাই মানবের জীবনের সার-রত্ন।

চরিত্র বিশুদ্ধ করিতে হইলে কিরূপে চরিত্র গঠিত হয়, তাহাই প্রথম দেখা কর্ত্তব্য। চরিত্র আদর্শে গঠিত হয়। আমরা অনুকরণের দাস, জন্মাবধি মরণপর্য্যন্ত আমরা পরস্পরের অনুকরণ করি। অনুকরণে আমাদের জাতীয়জীবন গঠিত হয় এবং অনুকরণের উপর আমাদের ভবিষ্যজীবনের শুভাশুভ নির্ভর করে। সৎলোকের অনুকরণে চরিত্র সৎ হয়, অসৎ-লোকের অনুকরণে চরিত্র অসৎ হয়। প্রকৃতপ্রস্তাবে এই অনুকরণই আমাদের শিক্ষা। এই অনুকরণ বা শিক্ষা প্রথমতঃ গৃহে আরম্ভ হয়। গৃহই চরিত্রগঠনের প্রধান কেন্দ্রস্থল। প্রথমতঃ স্বগৃহের লোকের স্বভাবে সন্তানের স্বভাব গঠিত হয়। তৎপর সদসৎসংসর্গদ্বারা এবং সর্ব্বশেষে, সমাজদ্বারা তাহা পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত হয়। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াই পরিবারস্থ-লোকের স্বভাবের অনুকরণ করিতে আরম্ভ করে। এই সময়, শিশুর মন একখানি স্বচ্ছদর্পণের ন্যায়। ইহার সম্মুখে তখন যাহা কিছু ধরা যায়, তাহাই ইহাতে প্রতিফলিত হয়। সুতরাং

শিশুসন্তানের চরিত্র উজ্জ্বলবর্ণে রঞ্জিত করিতে চাহিলে পরিবারস্থ লোকের সৎ হওয়া একান্ত আবশ্যক। যদি পরিবারস্থ লোকের মধ্যে কর্ত্তব্যজ্ঞান ও ভালবাসা বিদ্যমান থাকে, যদি তাঁহারা সৎ ও জ্ঞানী হন, তবে তাঁহাদের এই সকল সদ্‌গুণ সন্তান-সন্ততিতেও সংক্রমিত হয়। কিন্তু যদি তাঁহারা নিষ্ঠুর, অসৎ, কুসংস্কারাপন্ন হন তবে সন্তান-সন্ততিগণও তাঁহাদের স্বভাবের অনুকরণ করিয়া নিষ্ঠুর ও অধর্ম্মচারী হইয়া পড়ে।

পরিবারস্থ অন্যান্য লোক অপেক্ষা শিশুসন্তান মাতাপিতাকেই আদর্শ ধরিয়া তাঁহাদেরই স্বভাবের অনুকরণ করে। এই কালে পিতা মাতা শিশুর অন্তরে যে বীজ বপন করেন, তাহাই অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমে শাখা-প্রশাখা ও পত্র-পুষ্পাযুক্ত হয়। এই সময় শিশু জনক অপেক্ষা জননীরই স্বভাবের অনুকরণে অধিক যত্নশীল হয়। যতদিন সে মাতৃস্তন্য পান করে, তত দিন মাতাই তাহার শিক্ষয়িত্রী। যে গৃহে প্রসূতি জ্ঞানবতী, ভালবাসার আধার ও সদ্‌গুণে ভূষিতা, সেই গৃহে সন্তানও সেই সকল গুণে অলঙ্কৃত হইয়া থাকে। ফলতঃ শৈশবকালে জনক শিশুসন্তানের শিক্ষক এবং জননী তাহার শিক্ষয়িত্রী।

সাধারণতঃ পিতৃ-সন্নিধানে শিশুর বুদ্ধিবৃত্তি প্রখর এবং জ্ঞানের দ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়; মাতৃ-সন্নিধানে উহার হৃদয়ের কোমল-বৃত্তিগুলি বিকশিত হয়। ভক্তি, দয়া নম্রতাপ্রভৃতি হৃদয়ের সদ্‌বৃত্তিসমূহ মাতৃ-সন্নিধানে যেরূপ বিকশিত হয়, পিতৃ-সন্নিধানে বা অন্যত্র কখনই সেইরূপ হয় না। বিখ্যাত

দার্শনিক পণ্ডিত জন্ ষ্টুয়ার্ট্ মিল্ বিদ্বান্ পিতার নিকট সমুচিত শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু বাল্যকালে মাতৃবিয়োগ হওয়ায় মাতৃ-সন্নিধানে শিক্ষণীয় ভক্তি ও বিশ্বাস তাঁহার ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অতিশয় পরিশ্রমী, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক ছিলেন এবং তাঁহার মাতা অতিশয় কোমল-হৃদয়া ও পরদুঃখ-কাতরা রমণী ছিলেন। বিদ্যাসাগর-মহাশয় স্বীয় পিতার দৃঢ়তা, অধ্যবসায়, শ্রমশীলতা, ন্যায়পরায়ণতা ও আত্মনির্ভর প্রভৃতি গুণগুলি তাঁহারই নিকট হইতে শিক্ষা করেন এবং যে গুণে "দয়ার সাগর" বলিয়া জনসমাজে তিনি খ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন, সেই দয়াগুণ মাতৃ-সন্নিধানে শিক্ষা করেন। পিতৃদত্ত জ্ঞান ও মাতৃপ্রদত্ত কোমলতা একত্র সম্মিলিত হইয়া ঈশ্বরচন্দ্রকে "বিদ্যাসাগরে" ও "দয়ার সাগরে" পরিণত করিয়াছিল। ধ্রুবের জননী অতিশয় ধর্ম্মিষ্ঠা রমণী ছিলেন, তজ্জন্যই ধ্রুব শিশুকালে হরিপাদপদ্মলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিমাতার দুর্ব্বাক্যানলে দগ্ধহৃদয় হইয়া ধ্রুব কাঁদিতে কাঁদিতে মাতৃ-সন্নিধানে উপনীত হইলেন; জননী সন্তানের মলিন মুখ দেখিয়া বলিলেন, "বাছা, ভগবানকে ডাক, তিনিই তোমার সকল দুঃখ দূর করিবেন।" ধ্রুবের হৃদয়পটে মায়ের উপদেশ অঙ্কিত হইল। তিনি মরণ-ভয় তুচ্ছ করিয়াও বনে বনে ভ্রমণ করিয়া কায়মনোবাক্যে হরিকে ডাকিতে লাগিলেন; অচিরে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইল।

শঙ্করাচার্য্যের জননী অতিশয় বিদুষী ছিলেন। তাঁহার অনির্ব্বচনীয় কর্ত্তব্যজ্ঞান ও ধর্ম্মনিষ্ঠা ছিল বলিয়া শঙ্করাচার্য্য অলৌকিক প্রতিভা ও অসাধারণ ধর্ম্মজ্ঞান লাভে সক্ষম হইয়াছিলেন। শোলাঙ্কি-কুলের সুরতান-তনয়া তারাবাই রমণী হইয়াও যে বীরধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার মূল কারণ তদীয় জনক। তারাবাই শৈশবকালে যখন পিতৃক্রোড়ে শয়ন করিয়া থাকিতেন, তখন সুরতান তাঁহার নিকট আপন পূর্ব্বপুরুষ-গণের বীরত্বগাথা কীর্ত্তন করিতেন। অতি শৈশব হইতেই তারা এই সব বীরত্ব-কাহিনী শুনিয়া শুনিয়া বীর-ভাবে উদীরিত হইলেন, অবশেষে রমণীর বেশভূষা পরিত্যাগ করিয়া তদীয় কোমলাঙ্গ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করিলেন। তাঁহার পিতৃদেব আফগানকর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হইলে তারাবাই ধনুর্ব্বাণহস্তে সমর-প্রাঙ্গণে অবতীর্ণা হইয়া বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার রণনৈপুণ্য দেখিয়া শত্রুগণও তাঁহাকে সহস্রমুখে প্রশংসা করিয়া-ছিল। যদি সুরতান দুহিতাকে শৈশবে এই সব বীরত্ব-কাহিনী না বলিতেন, তবে তারাবাইয়ের জীবনস্রোতঃ নিশ্চয়ই অন্য দিকে প্রবাহিত হইত।

উদ্ধৃত দৃষ্টান্তগুলি হইতে ইহা স্পষ্টই উপলব্ধ হয় যে, সন্তান জীবননাট্যের প্রথমাঙ্কে পিতামাতার ও পরিবারস্থলোকের স্বভাবের অনুকরণ করে, তাঁহাদের স্বভাবের অনুকরণে তাহারও স্বভাব গঠিত হয়। এমন কি, পরিবারস্থলোকের অঙ্গসঞ্চালনাদি পর্য্যন্ত শিশু অনুকরণ করিয়া থাকে; পিতার যদি পদ্মাসন করিয়া

বসিবার অভ্যাস থাকে, তবে সন্তানও পদ্মাসন করিয়া বসে এইরূপ প্রায়ই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সন্তান মাতৃস্তন্য ছাড়িয়া জীবনের অন্য একটী সোপানে আরোহণ করে। এই সময়ে সে সঙ্গিগণের সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইয়া পড়ে। তখন সৎসঙ্গ পাইলে সে নিজেও সৎ হয়, অসৎ-সঙ্গ পাইলে অসৎ হয়। গুণ ও দোষ সদসৎসংসর্গ হইতে উৎপন্ন হয়। সৎসঙ্গ যেমন নানা গুণের আকর, অসৎসঙ্গ তেমনি নানা দোষের আধার। সৎসঙ্গগুণে মহাপাষণ্ডেরও অভ্যুত্থান হয় এবং অসৎসঙ্গ-দোষে সংযমী সাধুপুরুষেরও পতন হয়। সর্ব্বদা অসৎসঙ্গে থাকিলে, সৎ লোকেও অন্যের নিকট অসৎ বলিয়া প্রতীত হন। একটী গল্প আছে,—দশরথ-তনয় রামচন্দ্র যখন সীতার উদ্ধারার্থে সমুদ্রে সেতুবন্ধন করিতে আরম্ভ করেন, তখন সমুদ্রদেব তৎসমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন,—"প্রভো! কি অপরাধে আমাকে বন্ধন করিতেছেন"। রামচন্দ্র উত্তরে বলিলেন—"ঘোর পাপী দুষ্ট রাবণ তোমার তীরদেশে অবস্থিত থাকায় তুমি সংসর্গদোষে দুষ্ট এবং সেই জন্যই তোমার এই শাস্তি"। গল্পটী বড়ই শিক্ষাপ্রদ। নিত্যই দৃষ্ট হয় যে, অপরাধীর সংসর্গে থাকিয়া অনেক নিরপরাধ ব্যক্তিও কেবল সংসর্গদোষে ধর্ম্মাধিকরণে শাস্তি-ভোগ করিয়া থাকেন।

অসৎসঙ্গ বলিতে কেবল দুষ্টলোকের সহিত মিশামিশি বুঝায় না। কুগ্রন্থ পাঠ, কুচিত্র দর্শন, কুসঙ্গীত শ্রবণ ইত্যাদি সমস্তই অসৎসঙ্গ-মধ্যে পরিগণিত। সুতরাং যাহা পাঠ করিলে,

দর্শন করিলে, শ্রবণ করিলে, মনে কুভাবের উদয় হয়, তাহা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। কোন সাধুপুরুষের চিত্রদর্শনে অথবা সুগ্রন্থপাঠে মনে যে পরিমাণ পবিত্রভাবের উদয় হয়, কুচিত্র-দর্শনে, কুগ্রন্থের অধ্যয়নে মন ততোহধিক কলুষিত হইয়া পড়ে। ইহার কারণ অতি সহজেই উপলব্ধ হয়; মন অল্পকারণেই কুপথে ধাবিত হয়। মনের গতি ও জলের গতি একরূপ; জল নিম্ন-দিকেই প্রবাহিত হয়, মানুষের মনও সর্ব্বদা নিম্নদিকে ধাবিত হয়। জলরাশি যেমন সামান্যমাত্র ছিদ্র পাইলে চতুর্দ্দিকস্থ মৃত্তিকারাশি খনন করিয়া ইহাকে বৃহৎস্রোতস্বতীতে পরিণত করে, সেইরূপ মানুষের মনও সামান্যমাত্র কুভাবের প্রশ্রয় পাইলে, উহাকে অবশেষে বৃহত্তর করিয়া তুলে। সন্তান যাহাতে অসৎসঙ্গে মিশিয়া কোনরূপ কুভাব মনে পোষণ করিতে না পারে, উপযুক্ত পিতামাতা তৎপ্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবেন। কদাচ তাহাকে দুস্টলোকের সহিত মিশিতে দিবেন না। দুষ্টলোকের সহিত আলাপ করাও কোমলমতি বালকের পক্ষে অশেষ অনিষ্ট-দায়ক। তাহাকে সর্ব্বদা সৎলোকের সহবাসে থাকিতে দিবেন, তাহাতে প্রভূত উপকার সাধিত হইবে। তৈল যেরূপ কুসুম-সংসর্গে সৌরভান্বিত হয়, সাধু ও সজ্জন-সহবাসে বালক-বালিকাগণও সেইরূপ সদ্ভাবাপন্ন হয়। সাধু ব্যক্তির নিকট সর্ব্বদা উপদেশপূর্ণ ধর্ম্মকথা শুনিয়া ইহাদের সৎপ্রবৃত্তিগুলি বিকশিত ও অসৎপ্রবৃত্তিগুলি সঙ্কুচিত হয়।

ঋষিশ্রেষ্ঠ নারদ তাহার দৃষ্টান্ত। পুরাণের উপাখ্যানে

আছে,—দেবর্ষি নারদ এক দাসীর পুত্র, তিনি প্রভুকর্ত্তৃক সাধুসেবায় নিয়োজিত হইয়াছিলেন। সাধু-সহবাসে তাঁহার চিত্তশুদ্ধি হয়। সাধুদিগের নিকট সর্ব্বদা মনোহর ধর্ম্মকথা শুনিয়া তিনি হরিভক্তিপরায়ণ হইয়া উঠেন।

পরিণতবয়সে সমাজই অধিকপরিমাণে সন্তানের শিক্ষার স্থল হইয়া উঠে। তৎকালে সমাজের সামর্থ্য তাহার নিজের সামর্থ্য ও সমাজের সুখদুঃখই তাহার নিজের সুখদুঃখ। তখন সমাজেই সে সম্পূর্ণ গা ঢালিয়া দেয়, সেই স্রোতঃ যে দিকে ভাসাইয়া লইয়া যায়, সে সেই দিকেই চলিতে থাকে ; ইহার বিপরীতদিকে চলিবার তাহার ক্ষমতা বড় বেশী থাকে না। তাহার সমাজস্থ লোকের হৃদয় যদি অসৎভাবে পূর্ণ থাকে, তবে সে অসদ্ভাবাপন্ন না হইয়াই থাকিতে পারে না। অপিচ সমাজস্থ লোকের হৃদয় যদি সৎভাবে পূর্ণ থাকে, তবে তাহার হৃদয়ও সৎভাবে পূর্ণ হইয়া থাকে। যে সমাজে শিশুসন্তান শৈশব হইতে অবস্থান করে, সেই সমাজের আচার-ব্যবহার, রীতি নীতি, চলা-বসা প্রভৃতি সকলেরই সে অনুকরণ করে।

কয়েক বৎসর অতীত হইল, একজন ইংরেজ একটী ব্যাঘ্রীর প্রাণবধ করিয়া একটী অত্যাশ্চর্য্য শিশুসন্তান প্রাপ্ত হয়েন। ঐ শিশু মনুষ্যগর্ভসম্ভূত, কিন্তু অরণ্যে পশুসমাজে লালিত পালিত হওয়ায় সম্পূর্ণ পশুপ্রকৃতি লাভ করিয়াছিল। সে পশুর মত হস্ত ও পদের উপর ভর করিয়া যাতায়াত করিত ; মানুষের মত সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিত না। স্বর্গীয় মহাত্মা

কেশবচন্দ্র সেন যখন বিলাতে অবস্থান করিতেন, তখন তাঁহার আশ্রয়দাতার একটী শিশুসন্তান তাঁহাকে দেশে না আসিতে অনেক অনুরোধ করে, কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে না পারিয়া কয়েকটী সমবয়স্কবালককে যুদ্ধসাজে সজ্জিত করিয়া সেনমহাশয়ের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলিল—"এখন আপনি কিরূপে যান, দেখা যাবে। আপনার পথ রুদ্ধ করিব।" ইংরেজ-সমাজে লোকে যুদ্ধসাজে সজ্জিত হইয়া রণাভিনয় করিয়া থাকে। এই শিশু সন্তানটীও তাহাই শিক্ষা করিয়াছিল।

লোকশিক্ষার জন্য সমাজ-শাসন নিতান্ত আবশ্যক। বর্ত্তমান-সময়ে আমাদের সমাজে কেবল বিদ্বেষ, হিংসা, শঠতা, নীচাশয়তা-প্রভৃতি অসৎভাবই সম্যক্ পরিলক্ষিত হয়। ইহার ফলে আমরা যে অন্যান্য জাতি অপেক্ষা কত নিম্নে আছি এবং দিন দিন কতই অধোগামী হইতেছি তাহা ভাবিলে, হৃদয় ক্ষোভে ও দুঃখে পূর্ণ হইয়া উঠে। বর্ত্তমানসমাজের দোষেই আমরা জাতীয়জীবনে হীন এবং অধোগতির চরমসীমায় উপনীত। এই সমাজ-শোধনের জন্য মধ্যে মধ্যে দুই এক জন পরদুঃখকাতর হৃদয়বান্ পুরুষ উহার বিরুদ্ধে হস্তোত্তোলন করিয়া সমাজের প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহাতেও সমাজ সেইরূপ শিক্ষালাভ করে নাই। এখনও অনেকগুলি দোষ সমাজের হাড়ে হাড়ে থাকিয়া উহার অস্থি-মজ্জা ভক্ষণ করিতেছে। এই সকল দোষের হাত এড়াইতে না পারিলে আমরা কখনই আমাদের জাতীয়জীবন আবার লাভ করিতে পারিব না এবং আমাদের

সন্তানসন্ততিগণও উন্নতির ত্রিসীমায় উপনীত হইতে পারিবে না।

চরিত্রগঠনের উপায় ও পদ্ধতি উপরে বর্ণিত হইল। চরিত্র-সংশোধনের উপায় কি, অর্থাৎ একটী দুষ্কার্য্য অভ্যস্ত হইয়া পড়িলে কি উপায়ে সেই অপবিত্র-অভ্যাসের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারা যায়, তাহাই দেখা যাউক। কোন একটী কু-অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে হইলে সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা থাকা একান্ত আবশ্যক। "মদ আর খাইব না" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া অনেকেই পশ্চাৎ সেই প্রতিজ্ঞা পালন করিতে পারেন না। যখন মদের লিপ্সা বলবতী হইয়া উঠে, তখন পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া গিয়া অনেকে আবার সেই পাপে লিপ্ত হইয়া পড়েন। যাহা আপাতমধুর তাহা পরিত্যাগ করিতে মন সহজে অগ্রসর হয় না। সুতরাং কেবল সঙ্কল্প করিলে দুষ্কার্য্য হইতে বিরত হওয়া যায় না। সঙ্কল্পসাধনোপযোগী সামগ্রীর আবশ্যক; সেই সামগ্রী শ্রদ্ধা; সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা, ন্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধা। সৎপথে থাকিতে হইলে শ্রদ্ধার আবশ্যক; শ্রদ্ধাই পুণ্যের পবিত্র মন্দির। এই জন্যই মহর্ষি বেদব্যাস শ্রদ্ধাকে মহাদেবতা-স্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। যিনি যতই স্থিরপ্রতিজ্ঞ হউন না কেন, ন্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকিলে, তিনি কখনই নিজের অঙ্গীকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন না। "মদ খাইব না" এই সঙ্কল্পের সঙ্গে সঙ্গে যদি "মদ খাওয়া উচিত নয়" এই নৈতিকনিয়মের প্রতি শ্রদ্ধা থাকে, এবং মদের বিষয় যদি আর ক্ষণকালের জন্যও মনে স্থান না দেওয়া যায়, তবে সঙ্কল্প-

সিদ্ধির অধিক বিলম্ব হয় না। অসৎ-চিন্তার অনুধ্যান করিলে মনের কলুষতা কখনই দূর হয় না। বায়ু-সঞ্চালিত বহ্নির ন্যায় বরং ইহা ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। অসৎ চিন্তা না করাই দুরভ্যাস দূর করিবার প্রধান উপায়। স্থিরপ্রতিজ্ঞা, নৈতিক-নিয়মের প্রতি অকপট শ্রদ্ধা এবং অসৎ চিন্তাপরিত্যাগ এই তিনটীই চরিত্রসংশোধনের উপায়।

সৎসাহস।

ঈশ্বর-সৃষ্ট প্রাণি-জগতের মধ্যে মনুষ্য সকলজাতির শীর্ষ-স্থানীয়। কেন যে মানব প্রাণি-জগতের শীর্ষস্থানীয়, ইহার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইলে সহজেই উপলব্ধি হয়, মনুষ্যজাতির মধ্যে কয়েকটী বিশিষ্ট গুণ বিদ্যমান রহিয়াছে, ঐ সমস্ত বিশিষ্ট গুণাবলীই মনুষ্যের মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। যদি মানবের ঐ সমস্ত সদ্‌গুণ না থাকিত, তাহা হইলে মনুষ্য ও পশুতে কোনও প্রভেদ থাকিত না; মানব আর 'মানব'পদবাচ্য হইত না; পশুভাবাপন্ন একপ্রকার অভিনবজন্তুরূপে পরিগণিত হইত।

যে সমস্ত গুণের কথা উল্লিখিত হইল, তন্মধ্যে সৎসাহস অগ্রগণ্য। যে গুণ থাকিলে মানব মিথ্যা ও কপটতা প্রভৃতি অসৎপ্রবৃত্তিকে দূরে রাখিয়া সত্য ও সরলতাপ্রভৃতি সৎপ্রবৃত্তি দ্বারা আত্মাকে অলঙ্কৃত করিতে পারে, তাহারই নাম সৎসাহস। মানসিক বলই সৎসাহসের উৎপত্তিস্থান। যাহাদের মন দৃঢ় ও সবল, তাহাদের মধ্যেই এই সাহস দৃষ্ট হয়; আবার যাহাদের মন দুর্ব্বল, তাহাদের মধ্যে ইহার অভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। শারীরিক বল সৎসাহসের উৎপত্তি-স্থল নহে; শারীরিক বল হইতে অনেকত্র পাশব-সাহসের উৎপত্তি হয়। পাশব-

সাহস প্রাণি-জগতের সকল প্রাণীতেই অল্পাধিকপরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে; বিশেষতঃ ইহার আধিক্য পশুতেই পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু সৎসাহস মনুষ্যব্যতীত অন্য কোন প্রাণীতে প্রায়শঃ দেখা যায় না। এই সৎসাহসই মানবপ্রকৃতির একটী বিশেষত্ব।

সৎসাহসকে পাঁচশ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) সত্যের প্রতি আদর, (২) যাহা ভাল তাহা হইতে প্রত্যাবৃত্ত না হওয়া; (৩) যাহা ভাল তাহার পোষকতা করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করা, (৪) বলবান্ কর্ত্তৃক কোন অন্যায়কার্য্য করিতে অনুরুদ্ধ হইলে তৎসম্পাদনে অসম্মতিপ্রকাশ, (৫) কোন অন্যায়-কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে দেখিলে প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিয়া তৎপ্রতিকারের চেষ্টা করা।

১। সত্যের প্রতি আদর,—"বাক্য ও মনের যথার্থতার নাম সত্য; মিথ্যা বাক্য ও অযথার্থ চিন্তা পরিত্যাগ করিলেই সত্যব্রত পালন করা হয়।" মিথ্যা নানাপ্রকার হইতে পারে। শ্রীযুক্ত জ্ঞানানন্দ সরস্বতী মিথ্যা কথাকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন (১) প্রচলিত মিথ্যা-কথা, (২) অপ্রচলিত মিথ্যা-কথা। যে সমুদয় মিথ্যা কথা সমাজে সমাদৃতভাবে প্রচ-লিত আছে, এবং সভ্যতা ও শিষ্টাচার সর্ব্বপ্রকারে যাহার অনু-মোদন করিতেছে, তিনি তাহারই নাম দিয়াছেন "প্রচলিত মিথ্যা কথা"; যেমন "ভাল আছি", "কিছু না" ইত্যাদি। এবং যেগুলি শিষ্টাচারবিরুদ্ধ ও লোক-গর্হিত, তাহাব নাম দিয়া-ছেন "অপ্রচলিত মিথ্যা-কথা"।

এই দুই প্রকার মিথ্যা ব্যতীত আরও অনেকপ্রকার মিথ্যা আছে, যথা ;

(১) জিজ্ঞাসিত হইয়া কোন উত্তর না দেওয়া। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি অমুক বিষয়সম্বন্ধে কোন খবর জান কি ? এই প্রশ্নের উত্তর অবগত থাকিয়াও নিরুত্তর থাকিলে প্রকারান্তরে মিথ্যা বলা হয়।

(২) কোন কার্য্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া পশ্চাৎ সেই কার্য্য সম্পাদনে ত্রুটি করা। এই শ্রেণীর মিথ্যা সমাজে খুব অধিক-পরিমাণে প্রচলিত আছে। অনেকে কার্য্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া কার্য্যসম্পাদনে ত্রুটি প্রকাশ করেন। যাঁহাদের সত্যে অত্যন্ত দৃঢ় বিশ্বাস আছে, তাঁহারা কখনই এরূপ করেন না। সকলেই অবগত আছেন যে, অঙ্গীকার-পালনের জন্য রাজা দশরথ রঘুকুল-তিলক ধার্ম্মিক-শ্রেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্রকে বনে নির্ব্বাসন দিয়া স্বয়ং পুত্র-বিরহে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব প্রতিশ্রুতকার্য্য পালন করিবার জন্য লিক্ষবীশবংশীয় রাজন্যবর্গকে অসন্তুষ্ট করিতেও ত্রুটি করেন নাই। যখন বুদ্ধদেব সশিষ্যে 'বৈশানিরে' উপস্থিত হন, তখন সেই নগরবাসিনী অশ্বপালিকা নাম্নী একটী বারাঙ্গনা তাঁহাকে নিজগৃহে আহার করিবার নিমন্ত্রণ করে। দয়ালু বুদ্ধদেব সেই বারাঙ্গনার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হন। ইহার অব্যবহিত পরে 'বৈশানিরের' লিক্ষবীশ-বংশীয় রাজন্যগণ অতিসমারোহে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হন এবং পরদিবস রাজভবনে তাঁহার আহারের নিমন্ত্রণ করেন; সত্য-

পরায়ণ। বুদ্ধ তাঁহাদের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে অস্বীকৃত হইলেন; তিনি বলিলেন—"আমি অশ্বপালিকার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছি।" রাজন্যবর্গ বিষণ্ণবদনে তথা হইতে অগত্যা প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। প্রতিজ্ঞাপালনের জন্য ভীলবংশীয় "বালীয়" ও "দেব" আত্মীয়-স্বজন পরিত্যাগ করিয়া বাপ্পার সহিত বনে বনে ভ্রমণ করিয়া জীবনের অধিকাংশসময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

যাহারা মুখে খুব উচ্চদরের কথা বলিয়া কার্য্যতঃ তাহার কিছুই করে না এবং প্রকৃতপক্ষে কোন গুণ না থাকা সত্ত্বেও গুণের পরিচয় প্রদান করে, এই উভয়বিধ লোক মিথ্যাবাদী।

(৩) অসার কল্পনা; ইহাই অযথার্থ চিন্তা এবং ইহাও অসত্যের একটী অঙ্গ; যেমন উদ্বেগের বা দুঃখের লঘু কারণ থাকিলে তাহাকে গুরু বলিয়া কল্পনা করা।

কোন অবস্থাতেই অসত্যের আদর করা উচিত নহে; কারণ, মনুষ্যসমাজ সত্যের উপরই স্থাপিত। যে সমাজে সত্যের যথেষ্ট আদর ও অসত্যের ঘোরতর নিগ্রহ, সেই সমাজেই মনুষ্যের সদ্‌বৃত্তিনিচয় পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয়। সর্ব্বাবস্থায় সত্যকে মূলমন্ত্র করিয়া সংসার-ক্ষেত্রে বিচরণ করা উচিত।

নম্রতার সহিত দোষস্বীকার সত্যের এক মহৎ অঙ্গ। ইহাদ্বারা কেবল সত্যের প্রতি আস্থা প্রদর্শন করা হয়, এমন নহে; ইহা সমাজে শান্তি ও সদ্ভাবস্থাপনের একটী প্রকৃষ্টতম উপায়। কোন বিশেষদোষের কার্য্য করিয়াও যদি দোষ স্বীকার-পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করা যায় তাহা হইলে, উৎপীড়িতব্যক্তির

তখন মনের পরিবর্ত্তন ঘটে—কিন্তু হৃদয়ের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া এইরূপ দোষ স্বীকার করা উচিত, নতুবা ইহাদ্বারা কোন উপকার সাধিত হয় না। অল্পবয়স্ক বালকবালিকাকে বাধ্য করিয়া ঐরূপ দোষস্বীকার করাইলে, তাহাতে কোন উপকার হওয়া দূরে থাকুক, বরং ইহাদ্বারা প্রকারান্তরে মিথ্যারই প্রশ্রয় প্রদান করা হয়। কেবল কলহনিবারণের জন্য কাহাকে দোষস্বীকার করিতে বাধ্য করা নিতান্ত মূঢ়তার কার্য্য। কেহ কেহ দোষস্বীকার করিতে অপমান বোধ করেন; কিন্তু ইহাতে অসম্মানের কোন কথা নাই, পরন্তু ইহা দ্বারা সত্যনিষ্ঠা ও সরলতার পরিচয় প্রদান করা হয়।

কোন কোন ব্যক্তির মিথ্যা বলা এতদূর অভ্যস্ত হইয়া পড়ে যে, মিথ্যা বলিবার ইচ্ছা না থাকিলেও তাহারা সময় সময় অলক্ষিতভাবে সত্যের অপলাপ করে। যাহাদের মিথ্যা বলা এইরূপে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা আবার অভ্যাসের বলেই এই অসৎপ্রবৃত্তির হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন। প্রস্তাবান্তরে উক্ত হইয়াছে, অভ্যাস সৎকার্য্যে প্রয়োগ করিলে যেমন সুফল উৎপাদন করে, সেইরূপ অসৎকার্য্যে প্রয়োগ করিলে ইহা কু-ফল প্রসব করে। যদি সর্ব্বদা সত্য বলিতে সচেষ্ট হওয়া যায়, তাহা হইলে অভ্যাসের শক্তি দ্বারা সত্য বলিবার সংস্কার মনোমধ্যে বারংবার স্ফুরিত ও উদ্দীপিত হইতে থাকিবে, এবং কালে এই সংস্কারই দৃঢ়মূল হইয়া মিথ্যা বলিবার অভ্যাস নির্ম্মূল করিবে।

২। নানারূপে উৎপীড়িত হইয়াও যাহা ভাল তাহা হইতে প্রত্যাবৃত্ত না হওয়া দ্বিতীয়প্রকারের সৎসাহসের কার্য্য। ধর্ম্মবীর শিখগুরু বন্দু ও ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ এই শ্রেণীর সাহসী। যখন মোগলসম্রাটের আদেশে গুরুজি বন্দু সাত শত অনুচরসহ বন্দী হইয়া দিল্লীতে প্রেরিত হন, তখন তাঁহাদিগকে মোসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য নানারূপ প্রলোভন দেখান হয়। কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া মোসলমানেরা তাঁহাদের উপর নানারূপ অত্যাচার ও উৎপীড়ন আরম্ভ করে। ইহাতেও বন্দিগণকে অচল ও অটল দেখিয়া আততায়িগণ সাত দিবসে সাত শত শিখের শিরশ্ছেদ করে। শিখ-গুরু বন্দুকে একটী লৌহ-পিঞ্জরে আবদ্ধ করিয়া পথে পথে প্রদর্শন করা হয়। বন্দুর একটী শিশুসন্তান ছিল, বিধর্ম্মিগণ স্বীয় সন্তানকে ছুরিকাঘাতে বধ করিতে তাঁহার প্রতি আদেশ করে; শিখবীর উক্ত পৈশাচিক আদেশ পালনে অস্বীকৃত হওয়ায় তাহারা শিশুটীকে হত্যা করিয়া বন্দুর মুখে তাহার শোণিত প্রদান করে। এইরূপ উৎপীড়ন ও অত্যাচার সহ্য করিয়াও বন্দু স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন নাই। ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ পিতৃ-শত্রু হরির উপাসক ছিলেন। এই জন্য তিনি স্বীয় পিতা কর্ত্তৃক উত্তপ্ত-তৈলে নিক্ষিপ্ত, বিষধর দ্বারা দংশিত এবং আরও এবম্বিধ নানারূপ অত্যাচারে উৎপীড়িত হন; কিন্তু তথাপি, ধর্ম্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। যখন হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে অভয় দিতে চাহিলেন, তখন প্রহ্লাদ বলিলেন,—"যিনি সকল ভয়ের

অপহারী, যাঁহার স্মরণে জন্মজরাপ্রভৃতি সকল ভয়ই দূর হয়, সেই অনন্ত-দেব হৃদয়ে থাকিতে আমার ভয় কিসের?"

৩। উপহাসাস্পদ হইয়াও যাহা ভাল, তাহার পোষকতা করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করা।—সাহসের এই অঙ্গটীর অভাব আমাদের সামাজিক-উন্নতির একটী প্রধান অন্তরায়। সময় সময় আমাদের মনে অনেক ভাল ভাবের উদয় হয়, কিন্তু উহা সমাজ-প্রচলিত পদ্ধতির প্রতিকূল বলিয়া আমরা তাহা প্রকাশ করিতে সাহসী হই না। বস্তুতঃ ঈদৃশ তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া আমরা কেবল আমাদের নিজেরই অনিষ্ট সংসাধন করি। উদ্দেশ্য যদি সৎ হয়, তাহা হইলে স্বীয় মত প্রচার করাই কর্ত্তব্য। লোক-সমাজে যদি ইহা সমীচীন বলিয়া প্রতীত হয়, তাহা হইলে, আজ হউক আর দুই দিবস পরেই হউক, নিশ্চয়ই জনসমাজে ইহা গৃহীত হইবে। এই সাহসের বলেই অনেক ধর্ম্মবীর কুসংস্কারের অন্ধকার দূর করিয়া মানবসমাজের উন্নতি ও ধর্ম্মের পথ প্রশস্ত করিয়া গিয়াছেন। চৈতন্য, শাক্যসিংহ ও মহম্মদপ্রভৃতি ধর্ম্মবীরগণ ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। চৈতন্য যখন প্রথমে হরি-সঙ্কীর্ত্তনে মত্ত হন, তখন চতুর্দ্দিক্ হইতে দুষ্টলোক তাঁহাকে উপহাস ও ব্যঙ্গোক্তি করিত; এমন কি, জিগীষুব্যক্তিকর্ত্তৃক তিনি সময় সময় অপমানিত এবং লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন, তথাপি স্বীয় সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া ভীরুতা প্রদর্শন করেন নাই। এই সাহ-সের বলে শাক্যসিংহও নানা প্রলোভনের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া যজ্ঞে অসংখ্য পশুহত্যা প্রভৃতি কয়েকটি ঘৃণিতপ্রথা দেশ

হইতে দূরীকৃত করেন। ইসলামধর্ম্মপ্রচারক মহম্মদও নানারূপ উপহাস ও দুষ্টলোকের উৎপীড়ন অম্লানবদনে সহ্য করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি যে মূলমন্ত্র লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা হইতে স্খলিত হন নাই। অবশেষে এই ধর্ম্মবীর সৎসাহসের বলেই আরবপ্রভৃতি ভূভাগে সত্যের জয়পতাকা উড্ডীন করিয়া ইহ সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। বস্তুতঃ মহৎ-ব্যক্তিগণ যাহা ভাল বুঝিয়াছেন, তাহাই করিয়াছেন। লোকনিন্দা তাঁহাদিগকে কোন সৎকার্য্য হইতে বিরত করিতে পারে নাই। তাঁহারা ভগবৎপদে অটল বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সর্ব্বদা স্বীয় গন্তব্যপথে অগ্রসর হইয়াছেন।

৪। বলবান্ কর্ত্তৃক কোনরূপ অন্যায় কার্য্য করিতে অনুরুদ্ধ হইলে তৎসম্পাদনে অসম্মতি প্রকাশ করা।—ভীরু কাপুরুষ ভীমসিংহ যখন নিজরাজ্যরক্ষার্থে আমির খাঁর ঘৃণিতপরামর্শে স্বীয় দুহিতার প্রাণ-হরণে উদ্যত হন, তখন দৌলতসিংহনামক শিশোদীয়কুলের জনৈক সামন্ত এই শ্রেণীর সৎসাহসের যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করেন। ছুরিকাঘাতে কৃষ্ণকুমারীর প্রাণনাশ করিবার জন্য রাণা প্রথমতঃ উক্ত দৌলতসিংহকে নির্ব্বাচিত করেন। সৎস্বভাব দৌলতসিংহ যখন সেই লোমহর্ষণ অনুষ্ঠানের কথা শ্রবণ করিলেন, তখনই তাঁহার হৃদয় ঘৃণায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল; তিনি রাণাকে এই জন্য শত ধিক্কার দিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

৫। কোনরূপ অন্যায়কার্য্য অবাধে সম্পন্ন হইতেছে

দেখিতে পাইলে প্রাণপর্য্যন্ত উৎসর্গ করিয়া তৎপ্রতিবিধানের চেষ্টা।—ইহাই সৎসাহসের প্রধান অঙ্গ এবং ইহাই পরোপকারের চরম সীমা। ইতিহাসে এতৎসম্বন্ধে অনেক দৃষ্টান্ত আছে; এই স্থলে কেবলমাত্র দুইটী দৃষ্টান্ত সন্নিবেশিত হইল। একদা মৃগয়ায় যাইয়া প্রতাপসিংহ ও শক্তসিংহের মধ্যে লক্ষ্য-সম্বন্ধে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হয়। বিবাদ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; দেখিতে দেখিতে উভয়ভ্রাতা শেলহস্তে পরস্পরকে আক্রমণ করিলেন। শিশোদীয়কুলের সর্ব্বনাশ উপস্থিত দেখিয়া শুভাকাঙ্ক্ষী পুরোহিত বিবদমান ভ্রাতৃ-যুগলের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলেন, এবং বিবাদ হইতে বিরত হইবার জন্য উভয়ভ্রাতাকে নানারূপ অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন; কিন্তু ভ্রাতৃযুগল কিছুতেই প্রকৃতিস্থ হইলেন না দেখিয়া অবশেষে, স্বীয় বক্ষে ছুরিকাঘাত করিয়া নিজের জীবন বিসর্জ্জন দিলেন। এই লোমহর্ষণ ব্যাপার দেখিয়া উভয়ভ্রাতার চিত্ত আর্দ্র হইল; তাঁহাদেরই জন্য পরমহিতৈষী পুরোহিত প্রাণত্যাগ করিলেন দেখিয়া, তাঁহারা শাণিত অস্ত্র হস্ত হইতে দূরে নিক্ষেপ করিলেন এবং বিষণ্ণবদনে ও অশ্রুপূর্ণলোচনে স্ব স্ব ভবনে প্রত্যাগমন করিলেন। সপ্তদশশতাব্দীর মধ্যভাগে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ পুরোহিত সৎসাহস ও পরোপকারের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া ইহসংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। খৃষ্টের জন্মের প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে যখন রোমের অধিবাসিগণ অন্যের জীবন লইয়া ক্রীড়া করিতেন; তখনও এইরূপে একজন সন্ন্যাসী নিজ-

জীবন উৎসর্গ করিয়া সেই পৈশাচিক আমোদ রোমরাজ্য হইতে দূরীভূত করেন।

• যাঁহাদের এইরূপ সাহস আছে, তাঁহারা এ জগতে ধন্য; তাঁহারাই প্রকৃত মনুষ্যনামের অধিকারী; তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন ও জিতেন্দ্রিয়। তাঁহারা কখনই কর্ত্তব্যপালনে বিমুখ হন না, লোকভয়ে প্রবঞ্চনার আশ্রয় গ্রহণ করেন না এবং পরার্থে প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতেও কুণ্ঠিত হন না। যাহাদের এই সাহস টুকু নাই, তাহাদের আত্মার স্বাধীনতা নাই। বাস্তবিক যাহাদের সৎসাহস নাই, তাহারাই পরাধীন। পক্ষান্তরে যাহাদের ঐ সাহস আছে, তাহাদের মানসিক সদ্‌বৃত্তিসমূহ বিকশিত ও কুপ্রবৃত্তিগুলি লয়প্রাপ্ত হয়। সাম্রাজ্যের উপর আধিপত্যস্থাপন প্রকৃত স্বাধীনতা নহে; যথেচ্ছ অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিচালন এবং ভোগলালসার পরিতৃপ্তিসাধনও প্রকৃত স্বাধীনতা নহে; এই উভয়বিধ স্বাধীনতাই বহির্ম্মুখী, অচিরস্থায়ী; জল-বুদ্‌বুদের ন্যায় ইহাদের ক্ষণে উদয় ও ক্ষণে লয় হয়। মনের স্বাধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা; ইহাই চিরস্থায়ী। বাহ্যজগতের যতই পরিবর্ত্তন হউক না কেন, ঈদৃশ স্বাধীনতার ধ্বংস বা পরিবর্ত্তন নাই।

সৎসাহসের অভাব আমাদের অশান্তি ও অসুখের এক প্রধান কারণ। ইহার অভাবে সংসারে নানাবিধ দুঃখ করালমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবিরত মানব-হৃদয়ের শোণিতশোষণ করিতেছে। সৎসাহসের অভাবে সরলতা ও উদারতাপ্রভৃতি সদ্‌গুণের অভাব এবং কপটতা ও মিথ্যা প্রভৃতি অসদ্‌গুণের

বিকাশ হয়। ফলতঃ মনুষ্যসমাজে যদি সৎসাহসের সম্যক্ আদর থাকিত, তাহা হইলে, এই দুঃখদারিদ্র্যপূর্ণ বসুন্ধরা অমরাবতীর ন্যায় শোভান্বিত এবং দেবরাজের "নন্দনকানন" বলিয়া অনুভূত হইত; কেহ কাহারও প্রতি লোভ-কটাক্ষ করিত না; হিংসা, স্বার্থপরতা ও কপটতাপ্রভৃতি রিপু-সমূহ দূরে পলায়ন করিত এবং চতুর্দ্দিকে সুখ ও শান্তি চিরবিরাজিত হইত।

কর্ত্তব্যানুষ্ঠান।

আমরা কি জন্য এই সংসারে আসিলাম? চরাচরগুরু সর্ব্বগুণাধার পরমেশ্বর কেনই বা আমাদিগকে এই সংসারে প্রেরণ করিলেন? তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে সহজেই উপলব্ধি হয়, কর্ত্তব্যপালনের জন্য আমরা এই সংসারে আসিয়াছি। এই কর্ত্তব্যপালনের উপরই জগতের অস্তিত্ব নির্ভর করে।

শৈশবে যদি মাতা শিশুসন্তানকে স্তন্যদান অথবা যত্নাতিশয়-সহকারে লালনপালন না করেন তবে, শিশুর জীবনকুসুম কলিকাবস্থায়ই শুষ্ক হইয়া যাইবে। উপযুক্ত পুত্র যদি বৃদ্ধ-পিতার সেবাশুশ্রূষা না করে তবে অযত্নে বৃদ্ধের প্রাণ-বায়ু নিশ্চিতই অকালে বহির্গত হইবে। সংসারে সুখস্বাচ্ছন্দ্যে থাকিতে চাহিলে, একে অন্যের সাহায্য করিতে হইবে। এই রূপ পরস্পরীণ সাহায্য হইতে কর্ত্তব্যের উৎপত্তি। শিশুকে যত্নাতিশয়সহ-কারে লালনপালন করিতে পিতামাতা ধর্ম্মতঃ বাধ্য, তাহার লালনপালন সুতরাং, পিতামাতার অবশ্যকর্ত্তব্য-কর্ম্ম। পিতা-মাতার সেবাশুশ্রূষা করিতে সন্তান বাধ্য, পিতামাতার সেবাশুশ্রূষা করা সুতরাং সন্তানের অবশ্যকর্ত্তব্য-কর্ম্ম। জন্মাবধি মরণপর্য্যন্ত আমাদিগকে কর্ত্তব্যপালন করিতে হয়। কর্ত্তব্যপালন আমাদের প্রধান ধর্ম্ম। মনুষ্যজীবন কর্ত্তব্যের

সমষ্টি। মানুষ যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে, ততদিনই তাহাকে কর্ত্তব্যপালন করিতে হইবে।

কর্ত্তব্যকে প্রধানতঃ চারিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; (১) নিজের প্রতি কর্ত্তব্য (২) আত্মীয়স্বজনের প্রতি কর্ত্তব্য; (৩) প্রতিবাসী ও মনুষ্যসাধারণের প্রতি কর্ত্তব্য এবং (৪) স্বজাতি ও স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্য।

১। নিজের প্রতি কর্ত্তব্য—নিজের প্রতি কর্ত্তব্যের মূলমন্ত্র আত্মোন্নতি। আত্মোন্নতি ত্রিবিধ—শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক। দেহের সর্ব্বাঙ্গীণ পরিণতির নাম শারীরিক উন্নতি, মনের বা মানসিকবৃত্তিসমূহের পূর্ণবিকাশের নাম মানসিক উন্নতি এবং জীবাত্মার শৌচসাধনের নাম আধ্যাত্মিক উন্নতি। শরীর, মন ও আত্মা এই তিনটীর উন্নতিসাধন করাই নিজের প্রতি কর্ত্তব্যপালন।

দেহের বা অঙ্গপ্রত্যঙ্গসমূহের যথাবিধি পরিণতিসম্পাদন করিতে হইলে পরিশ্রম আবশ্যক। যে অঙ্গের যেই কার্য্য সেই অঙ্গকে সেই কার্য্যে যথাবিধি নিয়োগ করিলে, সেই অঙ্গের পরিণতি হয়; সুতরাং, শারীরিকপরিণতির জন্য প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে ইহাদের স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইবে।

মানসিকপরিণতির প্রধান উপকরণ শিক্ষা। মানসিকবৃত্তিসমূহের পরস্পরায় সামঞ্জস্য রাখিয়া প্রত্যেকটীর যথাবিধি অনুশীলন করিলে 'মানসিক পরিণতি' সাধিত হয়। মনোবৃত্তি-

গুলির মধ্যে যে গুলি সৎবৃত্তি তাহাদের প্রসারণ এবং যে গুলি অসৎবৃত্তি তাহাদের নিরোধ * আবশ্যক। অসদ্বৃত্তিগুলিকে সংযত এবং অনুশীলন দ্বারা সদ্‌বৃত্তিগুলিকে পরিস্ফুরিত করিলেই মানসিক উন্নতি সুসিদ্ধ হয়।

অসদ্‌বৃত্তি গুলিকে সংযত রাখাই আত্মসংযম। আত্মসংযম আধ্যাত্মিক-উন্নতির প্রধান অবলম্বন। সংযমসাধন করিতে পারিলেই ঈশ্বরে প্রেম ও ভক্তি স্থাপিত হয়; ঈশ্বরে প্রেম ও ভক্তি স্থাপিত হইলে হৃদয়ে অনুপম আনন্দের অনুভব হয়। ইহাই প্রকৃত সুখ; ইহারই নাম সন্তোষ। ইন্দ্রিয়ের চরিতার্থতা-সম্পাদনে প্রকৃতসুখলাভ হয় না। তাহা যদি হইত, তবে আর সংসারী বিরাগী হইত না; শুদ্ধোদনি ভোগবিলাসের কেন্দ্রস্থল রাজপ্রাসাদ ছাড়িয়া ভীষণহিংস্রজন্তুসঙ্কুল অরণ্যানীর আশ্রয় গ্রহণ করিতেন না; চৈতন্য দেব পরমরূপবতী যুবতী ভার্য্যাকে ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী সাজিতেন না। অর্থে যদি সন্তোষ লাভ হইত, তবে ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদকে আর সেইরূপ অসীমযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না। প্রহ্লাদ রাজাধিরাজের পুত্র ছিলেন; অর্থের বিনিময়েই সন্তোষ ক্রয় করিতে পারিতেন। ইন্দ্রিয়ের চরিতার্থতাসম্পাদনে বা অর্থে সন্তোষলাভ হয় না বলিয়াই, ইঁহারা এই সকল পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরপ্রেমে উন্মত্ত হইয়াছিলেন। সন্তোষ ঈশ্বরপ্রেমে ও ভক্তিতে। যাঁহারা ঈশ্বরে প্রেম ও ভক্তি স্থাপন করিতে পারেন,

* নিরোধ—বিষয়ে বিনিবৃত্তি।

সম্পদে বিপদে ভগবচ্চরণে মনঃপ্রাণ অর্পণ করিতে পারেন, তাঁহারাই প্রকৃতসন্তোষলাভে সমর্থ হন।

আত্মসংযম যে কেবল মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির মূল এমন নহে; সংযমী না হইলে আমাদের শারীরিক উন্নতিও সম্যক্‌রূপে সাধিত হয় না। শরীর, মন ও আত্মার অতি নিকট-সম্বন্ধ; শরীরের উন্নতি না হইলে মনের উন্নতি হয় না এবং মনের উন্নতি না হইলে অর্থাৎ অসদ্বৃত্তিগুলির নিরোধ করিয়া সৎপ্রবৃত্তিগুলিকে বিকশিত না করিলে, আত্মার উন্নতি হয় না। ইন্দ্রিয়সংযমব্যতীত শরীর পুষ্ট হয় না। যাহারা অতিশয় ইন্দ্রিয়পরায়ণ, তাহারা কখনও সুস্থশরীরে জীবনযাপন করিতে পারে না এবং শরীর সুস্থ না রাখিলে, সদ্‌বৃত্তিগুলির পরিস্ফুরণের চেষ্টা করা যাইতে পারে না। শারীরিক উন্নতির জন্যও আত্মসংযমশিক্ষা নিতান্ত আবশ্যক।

২। আত্মীয়স্বজনের প্রতি কর্ত্তব্য—কর্ত্তব্যের এই অংশকে নানাভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে; তন্মধ্যে আমরা প্রধান প্রধান কয়েকটীর বিষয় এই স্থলে উল্লেখ করিতেছি।

পিতামাতা ও সন্তানের কর্ত্তব্য—পিতামাতা নিজ নিজ পুত্র-কন্যাগণকে স্নেহ করিবেন কখনও তাহাদিগকে পাপকার্য্যে রত হইতে দিবেন না; সর্ব্বদা সাধুসঙ্গে থাকিতে দিবেন এবং যত্নাতিশয়সহকারে সুশিক্ষিত করিবেন। সন্তানের চলাবসার প্রতি দৃষ্টি রাখাও পিতামাতার একটী প্রধান কর্ত্তব্য। কোন কোন ভদ্রপরিবারস্থ বয়ঃস্থ লোকেরও চলাবসা এত জঘন্যরকমের

যে, বিশেষপরিচয় অবগত না হইলে, তাহাদিগকে নীচজাতীয় বলিয়াই প্রতীতি হয়। মানবের গতিবিধি, উপবেশনভোজনাদি ভব্যাভব্যের নির্ণায়ক, সুতরাং পিতামাতা সন্তানের চলাবসার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন এবং যদি ইহা কোনও অংশে অর্ব্বাচীন বলিয়া অনুভূত হয়, তখনই তাহার সংশোধন করিতে চেষ্টা করিবেন। অনেক অপরিণামদর্শী পিতামাতা আছেন, যাহারা স্বীয় পুত্রকন্যাকে অন্যায়কার্য্য করিতে দেখিয়াও বাৎসল্যবশতঃ বা অন্য কোন কারণে, কুকার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে কোনও চেষ্টা করেন না; ঈদৃশ জনকজননী সন্তানের শত্রুর কার্য্য করিয়া থাকেন।

সন্তানসন্ততি পিতামাতাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি এবং কায়মনোবাক্যে তাঁহাদের চরণসেবা করিবে। যে পিতামাতার শাসন অতিক্রম অথবা তাঁহাদের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন না করে, সে কৃতঘ্ন ও নরাধম। অযোধ্যাপতি রামচন্দ্র চতুর্দ্দশবৎসর বনবাসক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন তবু পিতার আজ্ঞা লঙ্ঘন করেন নাই। বীরবর চণ্ড রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া অশেষযন্ত্রণা ও অনুতাপ সহ্য করিয়াছিলেন, এমন কি, অবশেষে জন্মভূমি চিতোর-পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া মান্দুরাজ্যে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন তথাপি, মুহূর্ত্তের জন্য, পিতৃশাসন অতিক্রম করেন নাই। পিতামাতা যখন যে কার্য্য করিতে বলিবেন, অম্লানবদনে তখনই তাহা সম্পাদন করিবে, বিন্দুমাত্র বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিবে না। যখন পিতা কিংবা মাতা তোমাকে কোন অন্যায়-

কার্য্যের জন্য তিরস্কার করেন, তখন কোনরূপ কটূক্তি না করিয়া মনে করিবে, তোমার অন্যায় হইয়াছিল বলিয়াই তিরস্কৃত হইয়াছ। কোন দোষ না থাকা সত্ত্বেও যদি তুমি পিতামাতা কর্তৃক তিরস্কৃত হও তাহাও, অম্লানবদনে সহ্য করিবে।

পিতামাতা ও অন্যান্য গুরুজন আমাদের সকলের সেব্য, তাঁহারা আমাদের উপাসিতব্য। তাঁহাদের সেবা পরম ধর্ম্ম। মাতা পৃথিবী অপেক্ষা গুরুতর, পিতা আকাশ অপেক্ষাও উচ্চতর। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে, "পিতামাতা ও অন্যান্য গুরুজন ইহারা তিন লোক, তিন আশ্রম, তিন বেদ ও তিন অগ্নি স্বরূপ। পিতা গার্হপত্য, মাতা দক্ষিণ ও অন্যান্য গুরুজন আহবনীয় অগ্নি বলিয়া পরিগণিত; এই ত্রিবিধ অগ্নিই অতিশয় প্রশস্ত; কায়মনোবাক্যে এই তিনের আরাধনা করিলে অনায়াসে ত্রিলোক জয় করিতে পারা যায়।

গুরু ও শিষ্যের কর্ত্তব্য—গুরু শিষ্যকে যত্নাতিশয়সহকারে শিক্ষা দিবেন এবং নিজ সন্তানের ন্যায় তাহাকে ভালবাসিবেন ও শাসন করিবেন। শিষ্য স্বীয় অধ্যাপককে পিতার ন্যায় ভক্তি করিবে, গুরু যখন যেরূপ, আদেশ করেন, অম্লানবদনে তৎ-সাধনে অগ্রসর হইবে। কোন অবস্থায়ই গুরুর শাসন অতিক্রম করা উচিত নহে। গুরুর সন্তোষসাধনই প্রকৃত গুরু-দক্ষিণা, সুতরাং যাহাতে তিনি সন্তুষ্ট থাকেন, সর্ব্বদা তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে। রাজা জনমেজয়ের রাজত্বকালে আয়োদধৌম্য-

নামে এক তপস্বীর উপমন্যু, আরুণি ও বেদ নামে তিনটী শিষ্য ছিলেন। ইঁহারা সকলেই গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। আরুণি গুরুর শস্যক্ষেত্র রক্ষা করিতে আদিষ্ট হইয়া যখন অন্য কোন উপায়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না তখন, স্বয়ং স্রোতোমুখে পতিত হইয়া জলের গতিরোধ করিলেন। উপমন্যু গুরুর গোরক্ষণে নিযুক্ত হইয়া বৎস-মুখ-নিঃসৃত ফেনমাত্র পান করিয়া জীবনধারণ করিতেন; কিন্তু তাহাতেও গুরুকর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইয়া ক্ষুধানিবারণের জন্য অর্কপত্রভক্ষণ এবং ইহার ফলে অন্ধ হইয়া অশেষ ক্লেশ ভোগ করেন। আয়োদধৌম্যের অন্যতম শিষ্য বেদও সর্ব্বদা গুরুর সন্নিকটে থাকিয়া তদীয় পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিতেন এবং গুরু যখন যে আজ্ঞা করিতেন, অবিচলিতচিত্তে তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পাদন করিতেন।

ভ্রাতা ও ভগিনীর কর্ত্তব্য—তুমি তোমার নিজকে যেরূপ ভালবাস ও স্নেহ কর, তোমার ভ্রাতা ও ভগিনীদিগকেও সেইরূপ স্নেহ করিবে ও ভালবাসিবে। যেরূপে তাহারা সন্তুষ্ট থাকেন, প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিবে। গুরু শিষ্যের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করেন, কনিষ্ঠের প্রতি জ্যেষ্ঠের সেইরূপ ব্যবহার করা উচিত। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠকে সুপথে চালাইবেন। তিনি যদি কনিষ্ঠের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণ না করেন, যদি কর্ত্তব্যজ্ঞানে প্রণোদিত হইয়া দয়া ও ভালবাসার সহিত সুনীতি উপদেশ দেন, তবে অবশ্যই কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের বশীভূত ও তাঁহার

উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে যত্নশীল হইবে। জ্যেষ্ঠ কোন অন্যায় কার্য্য করিলেও কনিষ্ঠের তাহাকে অসম্মান করা অকর্ত্তব্য। পিতার ন্যায় জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা প্রতিপালন ও তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিবে। ভ্রাতা ও ভগিনীর মধ্যে প্রচুরপরিমাণে আত্মত্যাগ থাকা উচিত। উভয়ের মধ্যে এই গুণের অভাব ঘটিলে, পরস্পর দুঃখমোচনের সম্ভাবনা থাকে না। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও জ্যেষ্ঠা ভগিনী পিতামাতার স্থানীয়। পিতামাতার যেরূপ সেবাশুশ্রূষা করা উচিত, ইহাদেরও তদনুরূপ শুশ্রূষা করিবে।

দম্পতীর কর্ত্তব্য—স্ত্রী ও স্বামী পরস্পরকে তাহাদের দায়িত্ব বিশদরূপে বুঝাইয়া দিবেন এবং সেই দায়িত্ব পরিশোধ করিবার জন্য উভয়েই প্রাণপণে চেষ্টা করিবেন। স্বামী স্ত্রীর প্রতি আত্মবৎ ব্যবহার করিবেন এবং তাঁহাকে এরূপভাবে শিক্ষা দিবেন, যাহাতে সম্পদে বিপদে তিনি স্বামীর সহায় হইতে পারেন। যাহাতে স্ত্রী ধর্ম্ম-জীবন লাভ করিতে পারেন, গৃহকার্য্য সুন্দর ও সুচারু-রূপে সম্পাদন করিতে পারেন, নিজ দায়িত্ব বিশদরূপে বুঝিতে পারেন, এরূপ চেষ্টা স্বামীর একান্ত কর্ত্তব্য। স্বামী স্ত্রীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবেন এবং অন্তঃকরণের সহিত তাঁহাকে ভাল-বাসিবেন; কখনও স্ত্রীর সহিত কোনও অবস্থায় বিশ্বাসঘাতকতা করিবেন না। স্ত্রীর কর্ত্তব্য পতিসেবা, পতির শুশ্রূষা, প্রাণপণে স্বামীর হিতসাধন করা। স্বামীই ভার্য্যার পরমদেবতা, স্বামীর সেবাই তাঁহার একমাত্র গতি। শকুন্তলা স্বীয় পতি দুষ্মন্তকে

বলিয়াছিলেন—“মধুরভাষিণী ভার্য্যা আমোদসময়ে সখীর ন্যায়, ধর্ম্মকার্য্যে পিতার ন্যায় এবং পীড়াকালে মাতার ন্যায় আচরণ করিবেন।” স্বামীকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসিতে হয়, দেবতার মত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতে হয় এবং প্রেম ও ভক্তিসহকারে চিরকাল স্বামীসেবারূপ ব্রত পালন করিতে হয়। স্বামীর প্রতি ক্রোধ বা অসন্তোষ প্রকাশ করা কোন মতেই ভার্য্যার কর্ত্তব্য নহে। বস্তুতঃ যাহারা স্বামীর সেবাকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য করেন এবং স্বামীর সুখে দুঃখে নিজেও তন্ময় হইয়া তাঁহার হিত-সাধনে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহারাই নারীজাতির আদর্শস্থানীয়া। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, শ্রীবৎসপত্নী চিন্তা ও হরিশ্চন্দ্রের পত্নী শৈব্যাপ্রভৃতি এই শ্রেণীর আদর্শরমণী। রাম পিতৃসত্য পালন করিবার জন্য বনগমন করেন; সতী সাধ্বী সীতা তাঁহার অনুগামিনী হইয়া চতুর্দ্দশবৎসর বনে বনে ভ্রমণ, এবং অশেষবিধ কষ্ট ও অত্যাচার সহ্য করেন। শনির কোপে পড়িয়া রাজা শ্রীবৎস রাজ্যভ্রষ্ট এবং বনবাসী হন; পতিব্রতা চিন্তাদেবী তাঁহার অনুগমন করিয়া দীর্ঘকাল পতিসঙ্গে বনবাসক্লেশ সহ্য করেন। সত্যবানের পত্নী সাবিত্রী শ্বাপদসঙ্কুল গহনবনে প্রবেশ করিয়া পতিকে মৃত্যুর করালগ্রাস হইতে রক্ষা করেন। নলপত্নী দময়ন্তী এইরূপে স্বামীর সঙ্গে বনে বনে ভ্রমণ করিয়া স্বামীভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। স্বামীকে ঋণদায় হইতে মুক্ত করিবার জন্য হরিশ্চন্দ্রের পত্নী শৈব্যা ব্রাহ্মণভবনে দাসবৃত্তি অবলম্বন করেন।

প্রভু ও ভৃত্যের কর্ত্তব্য—প্রভু ভৃত্যের পিতৃস্থানীয়; প্রভুকে পিতামাতার ন্যায় ভক্তি ও শ্রদ্ধা এবং তদীয় উপকারসাধনে প্রাণপণে যত্ন করা উচিত। যে ব্যক্তি চিরকাল প্রভুর নিকট যথাবিধানে প্রতিপালিত ও কৃতকৃত্য হইয়া, কার্য্যকালে অহা বিস্মৃত হয়, তাহার ন্যায় কৃতঘ্ন ও মহাপাপী এজগতে আর নাই।

দাসদাসীগণকে সন্তানের ন্যায় স্নেহমমতা করা উচিত। যদি তাহাদের কোন দোষ লক্ষিত হয় তবে, মিষ্টকথায় দোষের সংশোধন করিতে চেষ্টা করিবে কিন্তু, কদাপি নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিবে না। অনেকে কটু কথা বলিয়া ভৃত্যগণের দোষ সংশোধন করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু ইহা তাহাদের গুণ নহে, দোষ; সংশোধিত হওয়া দূরে থাকুক বরং ভৃত্যগণকে ইহাতে অসৎপথে আরও অগ্রসর করিয়া দেয়। বিশ্বস্ত দাসদাসী প্রভুর উপকারার্থে নিজের সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করিতেও দ্বিধা বোধ করে না। দাসী পান্না স্বীয় তনয়ের শোণিতবিনিময়ে প্রভুবালক উদয়সিংহের জীবন রক্ষা করেন; প্রসিদ্ধ হলদিঘাট-ক্ষেত্রে প্রভুভক্ত মান্না নিজের জীবন উৎসর্গ করিয়া, প্রতাপ-সিংহকে আসন্ন বিপদ্ হইতে উদ্ধার করেন; ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় ভারতের অসংখ্যনরনারী প্রভুর সন্তানসন্ততির জন্য অশেষবিধ অত্যাচার সহ্য করেন। দাসদাসীগণের প্রতি কর্কশব্যবহার করিলে তাহারা পরোক্ষে প্রভুর নিন্দা করে, কর্ত্তব্য-সম্পাদনে মনোযোগী হয় না এবং প্রভুর অনিষ্টসাধনে তৎপর

হয়। স্নেহ করিলে তাহারা বিপৎকালে প্রভুর বাধ্য থাকে এবং সর্ব্বদা প্রভুর মঙ্গলকামনা করে; প্রভুর কোন আপদ্ বিপদ্ উপস্থিত হইলে তাহার প্রতিবিধানে যত্নশীল হয়, এমন কি, সময় সময় প্রাণপর্য্যন্ত উৎসর্গ করিয়া প্রভুকে ঘোরসঙ্কটে রক্ষা করে।

৩। প্রতিবাসী ও মনুষ্যসাধারণের প্রতি কর্ত্তব্য—

তোমার প্রতিবাসিগণকে স্নেহ করিবে ও সর্ব্বদা তাহাদের মঙ্গলসাধনে যত্নশীল হইবে; কখনও তাহাদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিবে না। যাহারা এই নীতির অনুসরণ করেন, রাজলক্ষ্মী অচিরে তাহাদিগকে নিজ অঙ্কে ধারণ করেন। এই নীতির অনুসরণ করিয়া মোগলসম্রাট আকবর "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো" বা প্রভৃতি অতিসম্মানসূচক অভিধানে অলঙ্কৃত হইয়াছিলেন; এই নীতির বলে সুচতুর জাহাঙ্গির এবং সাহজাহান দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া মোগলরাজ্য অক্ষুণ্ন রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন; পক্ষান্তরে এই নীতির মস্তকে কুঠারাঘাত করিয়া আরঙ্গজীব মোগলকুলের সর্ব্বনাশ সাধন করেন।

সজ্জনগণের যথোচিত সম্মান করা উচিত এবং বৃদ্ধ, অন্ধ, কাণ, পঙ্গু, বিকলাঙ্গ, বন্ধুহীন ও প্রব্রজিত ব্যক্তিগণের রক্ষণাবেক্ষণ করা কর্ত্তব্য। অন্যের উন্নতি দেখিয়া কখনও ঈর্ষাপরতন্ত্র এবং উপকারীর অপকারসাধনে প্রবৃত্ত হইবে না। যিনি তোমার উপকার করিবেন, তুমি প্রাণপণে তাঁহার প্রত্যুপকার করিতে চেষ্টা করিবে। রাণা সঙ্গের বিপৎকালে

যাঁহারা তাঁহাকে অভয় প্রদান করিয়াছিলেন, সম্পদে তিনি তাঁহাদের সকলেরই প্রত্যুপকার করিয়াছিলেন। সঙ্গ যখন আপন ভ্রাতা পৃথ্বীরাজের কঠোর অত্যাচার হইতে মুক্তিলাভের আশায় দীনবেশে নানা স্থানে বিচরণ করিতেছিলেন, তখন প্রমার-বংশীয় করিমচাঁদনামক জনৈক দস্যু তাঁহাকে আশ্রয় প্রদান করে। সঙ্গ চিতোরের সিংহাসনে সমারূঢ় হইয়াই আজমীরের একটী ভূমিসম্পত্তি করিমকে প্রদান করিয়া কৃতজ্ঞতার প্রকৃত পরিচয় প্রাদান করেন। যে কৃতঘ্ন উপকারীর অপকারসাধনে প্রবৃত্ত হয় সে নরাধম, মনুষ্যদেহধারী পশুবিশেষ।

অকারণে পরের অপকার করিতে গেলে ভগবান্ নির্দ্দোষের রক্ষাবিধান করেন, এদিকে পরাপকারীকেই তাহার কৃতকর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয়। রাজনীতিজ্ঞ সমরবিশারদ আকবর তদীয় পরমহিতৈষী মানসিংহের প্রাণবিনাশার্থ বিষাক্ত 'মাজন' প্রস্তুত কিরিয়াছিলেন; কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাকে তাহাকেই সেই 'মাজন' ভক্ষণ করিতে হইয়াছিল। ক্রূরচরিত্রা অরিসিংহের পত্নী বিষ-প্রয়োগে পরমোপকারী মন্ত্রী অমরচাঁদের প্রাণ বিনাশ করিয়া চিরলালিতা জিগীষার শান্তি বিধান করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু অচিরেই তাহাকে সমুচিত শাস্তি ভোগ করিতে হইয়াছিল। তিনি নিজ সচিবের প্রাণ বিনাশ করিয়া স্বদেশরক্ষার্থ যাহাকে আহ্বান করিয়াছিলেন, সে-ই বিশ্বাসের মস্তকে পদাঘাত করিয়া রাজ্য আত্মসাৎ করে।

৪। **স্বজাতি ও স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্য**—যাহারা আমার

সমানস্বার্থবিশিষ্ট, যাহাদের সুখ দুঃখ, অভাব অভিযোগের সহিত আমার নিজের সুখ দুঃখ, অভাব অভিযোগ অভিন্নভূমিতে অবস্থিত, যাহাদের সম্পদ্ বিপদ্ আমার নিজের সম্পদ্ বিপদ্ অর্থাৎ সমুদয় বিষয়েই যাহাদের সহিত আমার স্বার্থ একসূত্রে গ্রথিত, তাহারাই আমার স্বজাতি এবং আমার স্বজাতির দেশ বা বাস-স্থানই আমার স্বদেশ। স্বজাতির মঙ্গলের জন্য, স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধনের জন্য সকলেরই প্রাণপণে যত্ন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু স্বদেশের উন্নতিসাধন করিতে হইলে স্বদেশের প্রতি অনুরাগ বা ভালবাসা থাকা আবশ্যক। যদি স্বদেশের প্রতি অনুরাগ না থাকে, তবে স্বদেশের উন্নতিসাধনের ইচ্ছা কেবল পঙ্গুর গমনেচ্ছার ন্যায় নিষ্ফল। যেমন ব্যক্তিবিশেষের প্রতি ভালবাসা জন্মিলে সেই প্রিয়পাত্রের অভাবমোচন করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করা যায়, সেইরূপ স্বদেশ বা স্বজাতির প্রতি ভালবাসা জন্মিলেই স্বদেশের অভাবের প্রতি দৃষ্টি পড়ে এবং সেই সকল অভাব মোচন করিবার জন্য আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করি। কিন্তু যেমন ব্যক্তিবিশেষের প্রতি ভালবাসা জন্মিবার পূর্ব্বে তাহার সহিত পরিচয় হওয়া আবশ্যক, সেইরূপ স্বদেশের প্রতি ভালবাসা জন্মিবার পূর্ব্বে তাহার সহিত পরিচিত হওয়া আবশ্যক। স্বদেশের বা স্বজাতির সুখ দুঃখ, অভাব অভিযোগ প্রভৃতি বিশেষরূপে জানিতে হইবে।

স্বদেশের উন্নতিসাধনের বা স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্যপালনের মূলভিত্তি স্বদেশপ্রীতি বা স্বদেশপ্রেম। বড়ই আক্ষেপের বিষয়,

এই স্বদেশপ্রেমিকতা অতি অল্পলোকেই পরিলক্ষিত হয়। বর্ত্তমানসভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশানুরাগ, নিকৃষ্টজাতির প্রতি দয়া-প্রভৃতি কয়েকটী সৎপ্রবৃত্তি আমাদের মন হইতে ক্রমেই অন্তর্হিত হইয়া কোথায় যেন বিলান হইয়া যাইতেছে। যে স্বদেশানুরাগে ভারতসন্তানের জাতীয়জীবন গঠিত একদিন তাহারই প্রেরণায় এদেশের ললনা পর্য্যন্ত সুকুমার দেহে কঠিন লৌহবর্ম্ম পরিধান করিয়া রণচণ্ডীবেশে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেন; প্রাণাধিক তনয়কে নিজহস্তে লৌহবর্ম্মে সজ্জিত করিয়া সমরক্ষেত্রে প্রেরণ করিতেন; যে "জহরব্রতের" নামে আজ পর্য্যন্ত হৃদয় যুগপৎ বিষাদ ও বিস্ময়ে শিহরিয়া উঠে, শুধু স্বদেশের গৌরবরক্ষার জন্যই সেই "জহরব্রত" ভারতে অনুষ্ঠিত হইত।

কেবল অসিহস্তে সমরপ্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলেই স্বদেশানুরাগ প্রদর্শিত হয় না। স্বদেশের স্বাধীনতারক্ষা ইহার একটা প্রধান অঙ্গ বটে, কিন্তু কেবল ইহাতেই স্বদেশপ্রেমের পরিণতি নহে। স্বদেশের উন্নতি ও মঙ্গলকর যে কোন কার্য্যই করা যায় না কেন, তাহাই স্বদেশপ্রেমের অন্তর্ভুক্ত।

যখন আকবরসেনাকর্তৃক চিতোরনগর অবরুদ্ধ হয় তখন, কর্ম্মদেবী এই স্বদেশপ্রেমে প্রাণোদিতা হইয়া বালক পুত্রকে বলিয়াছিলেন,—"বৎস যুদ্ধে গমন কর, শত্রু আমাদের স্কন্ধের উপর অবস্থিত। তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া কর্ত্তব্য পালন কর।"

স্বদেশপ্রীতির জন্য স্বার্থত্যাগ একান্ত আবশ্যক। যতক্ষণ মনে স্বার্থাকাঙ্ক্ষা প্রবল থাকে, ততক্ষণ স্বদেশপ্রীতি জন্মিতে পারে

না; ত্যাগস্বীকার না করিলে অন্যের প্রতি ভালবাসা জন্মে না। যেখানে ভালবাসা সেখানেই ত্যাগস্বীকার। এই যে জনকজননী নিজে না খাইয়া সন্তানের আহার যোগাইতেছেন, লালনপালন করিতেছেন, তাহাও ত্যাগস্বীকার। অন্যকে ভালবাসিতে হইলে নিজের স্বার্থ ভুলিতে হইবে, নিজকে ভুলিয়া পরকে আপন করিতে হইবে। স্বদেশকে ভালবাসিতে হইলে, স্বদেশপ্রেমিক হইতে গেলে, স্বার্থ ভুলিয়া হৃদয়কে স্বদেশময় করিতে হইবে, স্বজাতির সুখে দুঃখে আত্মহারা হইতে হইবে। ইহাই বিশ্বজনীন ভালবাসা।

আমাদের কর্ত্তব্য অসংখ্য। যাহা কর্ত্তব্য ছিল আমি তাহা সম্পাদন করিয়াছি, আমার আর কোনও করণীয় নাই"—এই কথা বলিবার শক্তি আমাদের নাই। দেশ, কাল ও পাত্রানুসারে জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের সম্মুখে বিভিন্নশ্রেণীর কর্ত্তব্য আসিয়া উপস্থিত হয়।

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের নির্দ্ধারণ করিবার জন্য জগদীশ্বর আমাদিগকে ধর্ম্মবুদ্ধি বা বিবেকবুদ্ধি দিয়াছেন। ধর্ম্মবুদ্ধিই আমাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণের একমাত্র আশ্রয়। যখন আমরা কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হই, তখন বিবেকবুদ্ধি আমাদিগকে সতর্ক করিয়া দেয়। একটী দৃষ্টান্ত বলি। প্রসিদ্ধ হলদিঘাটের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া অরিদুর্ম্মদ প্রতাপসিংহ পর্ব্বতগুহার আশ্রয়ে অতিকষ্টে জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। তৃণবীজসংযোগে পরিপক্ক খাদ্যদ্রব্যই তখন তাঁহার নিজের ও স্নেহাধার পুত্রকন্যাগণের

জীবনধারণের একমাত্র সম্বল। একদা প্রতাপ সেই গিরিপ্রদেশে তৃণশয্যায় শায়িত আছেন, এমনসময় স্নেহময়ী দুহিতার ক্রন্দন-ধ্বনি তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল। তিনি কন্যাটির দিকে নয়ন ফিরাইয়া দেখিলেন, একটা বন্য বিড়াল শিশুর হস্তস্থিত তৃণবীজ-নির্ম্মিত পিষ্টকখণ্ড লইয়া পলায়ন করিতেছে। প্রতাপের হৃদয় মথিত হইয়া গেল; আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; চক্ষুর জলে তাঁহার বক্ষদেশ ভাসিয়া গেল। দুই দিবস পূর্ব্বে যাঁহার মস্তকোপরি রাজছত্র বিদ্যমান ছিল, যাঁহার স্নেহাধার পুত্র-কন্যাগণ নানাবিধ চর্ব্ব্য, চূষ্য, লেহ্য ও পেয় দ্বারা রসনার পরিতৃপ্তি সাধন করিত, তাঁহারই প্রাণাধিকা তনয়া একখণ্ড সামান্যপিষ্ট-কের জন্য রোদন করিতেছে, ইহা কি মানুষের সহ্য হয়? তিনি মনের আবেগে আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিয়া তৎসকাশে এক-খানি পত্র প্রেরণ করিলেন—কিন্তু পরক্ষণেই যখন বিবেক তাঁহাকে চুপি চুপি বলিয়া দিল যে, তিনি তাঁহার কর্ত্তব্য ভুলিয়াছেন, তখনই পূর্ব্বপ্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া আবার অসিহস্তে দণ্ডায়মান হইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। বিবেকের দংশনে তাঁহার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল। স্বদেশের প্রতি প্রতাপসিংহের যে কর্ত্তব্য ছিল সেই কর্ত্তব্য-দায় হইতে মুক্তি লাভ করিবার জন্য প্রতাপ প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী "দিল্লীশ্বরো বা, জগদীশ্বরো বা" আকবরের বিরুদ্ধে অসিধারণ করেন এবং ক্রমাগত পঞ্চবিংশতিবৎসর কঠোর বনবাসব্রত অবলম্বন করিয়া স্বদেশপ্রেমের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখে রাখিয়া গিয়াছেন।

প্রতাপ জীবনে আর কখনও কর্ত্তব্যের আহ্বানে অনাদরপ্রদর্শন করেন নাই। এই সংসারসমুদ্রে তিনি বিবেককেই কর্ণধার করিয়াছিলেন এবং বিবেকপ্রদর্শিত পন্থা ধরিয়া কর্ত্তব্যতরণি পরিচালিত করিয়াছিলেন। আজ তিনি সকলের নমস্যদেবতা; ভারতের আপামর নরনারী তাঁহার পূজা করিয়া থাকে।

একজন যাহা অন্যায় বলিয়া মনে করে, অনেকসময় অন্যের তাহা কর্ত্তব্য মনে করা বিচিত্র নহে। যদি বিবেক সকলকেই সত্যের অভ্রান্ত আলোক প্রদর্শন করিতে সর্ব্বাবস্থায় সমর্থ হইত, তাহা হইলে এরূপ বৈচিত্র্য ঘটিত না। আমি যাহা অন্যায় বলিয়া স্থির করিতে পারিলাম, তুমি তাহা পারিলে না কেন? বিবেক-বুদ্ধির ন্যূনাধিক পরিস্ফুরণ ইহার কারণ। আমার বিবেকবুদ্ধি যতদূর পরিস্ফুরিত হইয়াছে, তোমার বিবেকবুদ্ধি ততদূর পরি-স্ফুরিত না হইলে, আমি যাহা অন্যায় বলিয়া স্থির করিতে পারি-য়াছি, তুমি তাহা পারিবে না। আমাদের মন শ্রদ্ধা, ঘৃণা, হিংসা, প্রেম, সহানুভূতি ইত্যাদি প্রবৃত্তির সমষ্টিমাত্র। এই সকল প্রবৃত্তির মধ্যে কতকগুলি সৎপ্রবৃত্তি ও কতকগুলি অসৎপ্রবৃত্তি। আমরা যত কার্য্য করি, তৎসমস্তই কোন-না-কোন প্রবৃত্তিদ্বারা প্রণোদিত হইয়া সেই প্রবৃত্তির কার্য্য ন্যায্য কি গর্হিত তাহা অন্যান্যপ্রবৃত্তির সহিত তুলনা করিয়া স্থির করি। বিবেকই এই তুলনার কার্য্য সম্পাদন করে। বিবেক প্রথমতঃ অসংস্কৃতাবস্থায় থাকে, তখন ইহার এই তুলনা করিবার শক্তি অতি অল্প বা কিছুমাত্র থাকে না; পরে সাধুসংসর্গ,

সৎগ্রন্থপাঠ ইত্যাদি দ্বারা ক্রমে ইহার মলিনতার আবরণ দূর হইয়া যায়। সাধুসংসর্গ ও সৎগ্রন্থপাঠ ইত্যাদি বিবেকের উদ্দীপক কারণ। এইগুলি দ্বারা বিবেক বিকশিত হয়। যেরূপ একটী আম্রবীজকে মৃত্তিকায় রোপণ করিয়া তাহাতে নিয়মমত জলসেচন করিলে, ইহা ক্রমে বৃক্ষে পরিণত হইয়া ফলধারণে সক্ষম হয়, সেইরূপ বিবেকও পরিস্ফুরিত হইলে ন্যায়ান্যায়বিচারে অধিকার লাভ করে। আম্রবীজ যেরূপ মৃত্তিকা ও জলের সহযোগ-ব্যতীত বৃক্ষে পরিণত হইয়া ফলধারণে সক্ষম হয় না, বিবেকও সেইরূপ সাধুসংসর্গ সৎগ্রন্থপাঠ ইত্যাদি দ্বারা পরিস্ফুরিত না হইলে প্রবৃত্তিনিচয়ের গুরুত্ব লঘুত্ব অবধারণ করিতে পারে না। পুরাকালে রোমরাজ্যে 'গ্লেডিটরিয়ল' যুদ্ধ নামে একপ্রকার কৌতুক-প্রদ ক্রীড়া হইত। যুদ্ধে পরাজিত বন্দিগণ এই প্রাণঘাতী কৌতু-কের ক্রীড়াপুত্তল ছিল। দুইজন বন্দীর হস্তে দুইখানা শাণিত তরবারি দিয়া তাহাদিগকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করা হইত এবং উভয়ের মধ্যে যে প্রতিপক্ষের প্রাণবধ করিয়া যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিত, তাহাকে বন্ধনদশা হইতে মুক্তি প্রদান করা হইত। কখন কখন বন্দীকে সিংহব্যাঘ্রপ্রভৃতি মারাত্মকহিংস্রজন্তুর সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আদেশ দেওয়া হইত এবং যুদ্ধে কোনরূপে প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রাণবধ করিতে পারিলে তাহার মুক্তিলাভ ঘটিত; কিন্তু এইরূপ প্রবলশত্রুর সহিত প্রতিযোগিতা করিতে গিয়া হতভাগ্যকে প্রায়ই প্রাণ লইয়া ফিরিয়া আসিতে হইত না। প্রতিবৎসর রোমরাজ্যে এইরূপ বীভৎসকাণ্ডের অভিনয় হইত;

অন্যের প্রাণ লইয়া ক্রীড়া করা যে একটী অন্যায় কার্য্য ইহা ক্ষণকালের জন্যও রোমীয়গণের মনে স্থান পাইত না। এই কার্য্যে তাহারা যে সুখানুভব করিত, তাহাতেই তাহাদের উচ্চতর সদ্বৃত্তিগুলি আচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছিল। পরে একদা কোন ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসী এই বীভৎস অভিনয় দেখিয়া, তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করেন, কিন্তু কেহই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না দেখিয়া তিনি লম্ফপ্রদানপূর্ব্বক দুইটী মল্লযোদ্ধার মধ্যে পতিত হইয়া স্বীয় জীবন উৎসর্গ করেন। যখন ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসী সর্ব্বসমক্ষে নিজ প্রাণ উৎসর্গ করিলেন, তখনই রোমানগণের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল। তাহারা বুঝিতে পারিল যে, একটী নীচপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া একটী উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তিকে তাহারা দূরে নিক্ষেপ করিতেছে। সেই দিন হইতেই তাহারা সেই নিষ্ঠুরক্রীড়া পরিত্যাগ করে।

ব্রহ্মার একটীমাত্র কথায় মহাপাপী রত্নাকরের বিবেক পরিস্ফুরিত হইয়াছিল। একমাত্র সাধুসন্দর্শনে বীরবর শিবাজির মৃগয়াপিপাসার নিবৃত্তি ঘটিয়াছিল। একদা বীরবর শিবাজি মৃগয়ার্থ বনে গমন করেন। তাঁহার উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া পক্ষীগুলি ভয়ে পলায়ন করিতে আরম্ভ করে। শিবাজি তাহাদের অনুধাবমান হন। অনেক দূর পর্য্যন্ত উড়িয়া গিয়া পক্ষীগুলি এক সংযতাত্মা যোগীর আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করে। ক্রমে শিবাজিও তথায় উপস্থিত হইলেন কিন্তু, শিবাজিকে তথায় দেখিতে পাইয়াও, বিহঙ্গগণ আর পলায়ন করিল না। সেই যোগিবরকে নয়নগোচর

করিবামাত্র নিজকে শতধিক্কার দিয়া শিবাজি পক্ষিকুলের অনুসরণে নিরস্ত হইলেন। তিনি মনে মনে কহিলেন,—“আমি কি নিষ্ঠুর, সামান্যসুখের জন্য এতগুলি পক্ষীর প্রাণবধ করিতে উদ্যত হইয়াছি। আমার রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া পক্ষিগণ প্রাণভয়ে পলায়ন করিল, আর সন্ন্যাসীকে দেখিয়া তাহারা যেন প্রাণ পাইল।” তৎকালে সাধুদর্শনে শিবাজির বিবেক পরিস্ফুরিত হইয়াছিল। তিনি অনুতপ্তহৃদয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। উক্ত দুই স্থানে সাধুসংসর্গ ও সাধুর সদ্দৃষ্টান্ত বিবেকের উদ্দীপক কারণ; এই উদ্দীপককারণের সাহায্যে বিবেক পরিস্ফুরিত হইয়াছিল।

অন্যের প্রাণ লইয়া ক্রীড়া করাই যাহাদের আমোদ ছিল, তাহারা সন্ন্যাসীর জীবনবিসর্জ্জনে উৎফুল্ল না হইয়া কেনই বা পূর্ব্বকার্য্য স্মরণ করিয়া অনুতপ্তহৃদয়ে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিল? আর শিবাজিই বা কেন অকস্মাৎ পক্ষিহননে নিবৃত্ত এবং অনুতপ্ত হইলেন? ইহা হইতে স্পষ্টই উপলব্ধি হয়, অতি সামান্য উদ্দীপক কারণের সাহায্যেও আমাদের বিবেক পরিস্ফুরিত হইয়া, আমাদিগের জীবনের গতি স্থির করে।

অনেকসময় ন্যায় এবং অন্যায়ের নির্ণয় করিতে পারিয়াও আমরা অন্যায্য কার্য্যেই প্রবৃত্ত হই, ইহার কারণ, মানবহৃদয়ের দুর্ব্বলতা। দুর্ব্বলহৃদয় অসৎপ্রবৃত্তির আশ্রয়স্থল। যাহাদের হৃদয় সামান্যপ্রতিঘাত সহ্য করিতে পারে না, তাহারাই অসৎ-প্রবৃত্তির প্রশ্রয় দিয়া থাকে; কিন্তু যাহারা স্থিরপ্রতিজ্ঞ এবং

যাহাদের হৃদয়ে নৈতিকবল আছে, তাঁহারা কখনই ন্যায়ের পথ পরিত্যাগ করিয়া অসৎপথ অবলম্বন করেন না। স্থিরপ্রতিজ্ঞতা এবং নৈতিকসত্যের প্রতি অকপট শ্রদ্ধা, ন্যায়ের পক্ষে অবিচলিত থাকিবার প্রধান হেতু।

কর্ত্তব্যজ্ঞান মানুষের মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। ইহা মনুষ্যকে সৎপথে চালিত করে। কর্ত্তব্যজ্ঞান কেবল ব্যক্তিগত উন্নতির নিদান নহে, ইহা জাতিগত উন্নতিরও মূলভিত্তি। যে জাতির মধ্যে এই কর্ত্তব্যজ্ঞান অচল ও অটলভাবে বিদ্যমান থাকে, সেই জাতির অধঃপতন কখনই সম্ভবপর নহে; কিন্তু যখনই কোন জাতির মধ্যে ইহার অভাব পরিলক্ষিত হয়, তখনই সেই জাতির অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে এবং ইহার পুনরুদয় না হওয়া পর্য্যন্ত, সেই জাতি আর কখনই উত্থানলাভে সমর্থ হয় না। জগতের ইতিহাস ইহার প্রমাণ। কর্ত্তব্যনিষ্ঠপুরুষগণের সাধনা-ভূমি ভারতবর্ষ অধুনা ঘোরতমসাচ্ছন্ন। একজন সামান্য প্রহরীর কার্য্য উল্লেখ করিলেই ইহার উপলব্ধি হইবে। রাজা দুর্জ্জনশালের সময়ে চিতোরের পূর্ব্বপ্রথানুসারে সূর্য্যাস্তের পরই তোরণদ্বার রুদ্ধ করা হইত। একদা রাজা কোন যুদ্ধে পরাভূত হইয়া রজনীর তৃতীয়প্রহরসময়ে তোরণদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হন। দুর্জ্জনশাল দ্বারোদ্ঘাটনের জন্য প্রহরীকে অনেক বলিলেন, এমন কি, তিনি রাজা বলিয়াও আত্মপরিচয় দিলেন, কিন্তু প্রহরী কিছুতেই দ্বারোন্মোচন করিল না, বরং রাজার প্রতি অস্ত্রোত্তোলন করিল। রাজা ভয়ে তথা হইতে পলায়ন করিয়া একটী ভগ্ন-

দেবমন্দিরে রজনী অতিবাহিত করিলেন। প্রভাতে প্রহরী সহচরদিগের নিকট এই বৃত্তান্ত বলিতেছে, এমনসময়, দুর্জ্জনশাল তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া প্রহরী স্বীয় তরবারি রাজার পদতলে রাখিল এবং ধীরভাবে তাঁহার আদেশের প্রতীক্ষায় রহিল। রাজা কোনরূপ কটূক্তি না করিয়া তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠার জন্য তাঁহাকে অনেকগুলি মূল্যবান্ দ্রব্য উপহার দিলেন। অতএব আপন আপন কর্ত্তব্যসাধনই সিদ্ধিলাভের মুখ্য পন্থা।

কর্ম্মশীলতা।

জীবের অধিষ্ঠান-ভূতা ধরিত্রী যখন বাল্যক্রীড়ায় রত ছিলেন, যখন তাঁহার সন্তানগণ পশুহনন করিয়া জীবনধারণ করিত, তদানীন্তন অবস্থার সহিত বর্ত্তমানের তুলনা করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, আমরা অধুনা পুরাকালের তুলনায় উন্নতির একটী উচ্চতরসোপানে অবস্থিত। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, এই উন্নতির কারণ কি? ইহার কারণ উদ্যম ও অধ্যবসায়। কর্ম্মই আমাদের উন্নতির উৎসস্বরূপ; ইহাই সুকৃতি ও দেবত্ব লাভের একমাত্র উপায়। বস্তুতঃ কি উপায়ে আমাদের কর্ম্ম করিবার শক্তি বর্দ্ধিত হইতে পারে এবং কর্ম্মকর্ত্তৃগণের কি কি গুণ থাকা আবশ্যক, তৎসমুদয় অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর কর্ম্ম করিবার জন্যই আমাদিগকে ধরাধামে প্রেরণ করিয়াছেন এবং কর্ম্ম করিবার দুইটী উপায়ও দিয়াছেন; তাহার একটী শরীর ও অন্যটী মন। এই দুইটীর সাহায্যে আমরা সংসারে যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করি, সুতরাং ইহাদের যত পরিণতি হইবে, আমাদের কর্ম্ম করিবার শক্তিও ততই বৃদ্ধি পাইবে।

আমাদের শারীরিক ও মানসিক পরিণতির অনেক উপায় আছে, তৎসমুদয় সবিস্তার বর্ণন করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে;

এস্থলে আমরা অতিসংক্ষেপে কেবলমাত্র দুই একটীর কথা বলিব।

অভ্যাসগুণে আমাদের শারীরিক পরিণতি হয় এবং তৎসঙ্গে কার্য্য করিবার শক্তিও বিকসিত হয়। একটী কার্য্য বার বার করার নাম অভ্যাস, যখন আমরা প্রথমতঃ 'ক, 'খ, ইত্যাদি বর্ণমালা লিখিতে আরম্ভ করি, তখন কেবল একটী অক্ষর লিখিতে আমাদের এক মিনিট সময়ের আবশ্যক হয়; কিন্তু পাঁচবার ছয়বার সেই অক্ষরটী লিখিলে, পরে আর তত সময়ের আবশ্যক হয় না। এই অক্ষরটী আমরা যতই লিখিব, আমাদের হস্তেরও তদ্বিষয়ে ততই পরিণতি ঘটিবে। বাস্তবিক তোমার একখানি কাপড় সেলাই করিতে যত সময় আবশ্যক একজন সূচীকর্ম্মপটু সেই সময়ে, হয়ত পাঁচখানা কাপড় সেলাই করিতে পারিবে; কারণ তোমার হস্তের পরিণতি হয় নাই, সূচীকের হস্তের পরিণতি হইয়াছে। তোমার পাঁচ ক্রোশ পথ গমন করিতে যত সময় লাগিবে, অন্য একজন হয়ত সেই সময়ে দশ ক্রোশ পথ গমন করিতে পারিবে; তোমার পদের পরিণতি হয় নাই; অন্যের পদের পরিণতি হইয়াছে। এই সংসারে উন্নতি লাভ করিতে হইলে, অল্পসময়ে কার্য্য করা আবশ্যক এবং অল্পসময়ে কার্য্য করিতে হইলেই অভ্যাস চাই। অভ্যাসব্যতীত কখনও অল্পসময়ে কোনও কার্য্য সুসম্পন্ন করা যায় না। একটী কার্য্য আরম্ভ করিলে ইহা প্রথমে অতি কষ্টকর বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু অবশেষে অভ্যাস-গুণে তাহা অনায়াসসাধ্য হইয়া উঠে। অভ্যাস

সৎকার্য্যে প্রযুক্ত হইলে সুফলপ্রদ হয়, কিন্তু আবার অসৎ-কার্য্যে প্রয়োগ করিলে ঘোরতর অনিষ্টদায়ক হইয়া উঠে; কারণ যাহা একবার অভ্যস্ত হইয়া পড়ে, তাহা আর সহজে দূরীকৃত হয় না; অতএব ভ্রমেও যেন ইহা অসৎকার্য্যে নিয়োজিত না হয়।

অভ্যাস-গুণে যে শারীরিক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পরিণতি হয়, ইহা সকলেই সচরাচর প্রত্যক্ষ করেন। এক্ষণে মনের পরিণতি কিরূপে হয়, তাহাই দেখা যাউক। কর্ম্মকর্ত্তৃগণের দুইটী বিশিষ্ট-গুণের আবশ্যক; ইহার একটী প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও অন্যটী অনাগতবিধাতৃত্ব। সহসা কোন কার্য্য উপস্থিত হইলে আপনার বুদ্ধিদ্বারা অচিরাৎ তাহার অবধারণাদি করার নাম প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, এবং যিনি এইরূপ করিতে সক্ষম, তাঁহাকেই প্রত্যুৎপন্নমতি বলা যায়। ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া কার্য্যানুষ্ঠান করার নাম পরিণাম-দর্শিতা বা অনাগতবিধাতৃত্ব এবং এইরূপ কর্ম্মকর্ত্তাকে পরিণাম-দর্শী বা অনাগতবিধাতা বলে। সংসারে উন্নতি লাভ করিতে হইলে পূর্ব্বোক্ত দুইটী গুণের বিশেষপ্রয়োজন; দুইটী গুণই অভিজ্ঞতা বা বহুদর্শিতা হইতে উৎপন্ন হয়; বহুদর্শিতালাভ সুতরাং কর্ম্মকর্ত্তৃগণের অতীব আবশ্যক। "অমুক এই কার্য্য এই প্রণালীতে সংসাধন করিয়া এই ফল পাইয়াছেন বা সঙ্কট-কালে এই কার্য্য করিয়া এই ফল সিদ্ধি হইয়াছে", এইরূপ দেখিয়া শুনিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ হয়, তাহারই নাম বহুদর্শিতা। উক্ত সংজ্ঞা হইতে ইহা সহজেই উপলব্ধি হয় যে, অন্যের কার্য্য-

কলাপ দেখিয়া শুনিয়া বা পুস্তকে পড়িয়া আমাদের বহুদর্শিতা লাভ হয়। এই বিষয়ে ইতিহাস এবং মহৎলোকের জীবনচরিত-পাঠ শ্রেয়ঃ। অতিসংক্ষিপ্ত ইতিহাসপাঠে বহুদর্শিতা লাভ হয় না। "অমুক অমুকের পর, অমুক সনে রাজা হইয়া এত দিবস রাজত্ব করিলেন," এইরূপ অস্থি-মাত্রাকার ইতিহাস পড়িয়া কোন ফল লাভ হয় না। যেরূপ সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পড়িয়া অভিজ্ঞতা লাভ হয় না, সেইরূপ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কেবল আমোদের জন্য দেশ-ভ্রমণে বহির্গত হইলেও অভিজ্ঞতা লাভ হয় না; অনুসন্ধিৎসু হওয়া আবশ্যক; যাহারা বাল্যকালে এই গুণে অলঙ্কৃত থাকে, তাহারা কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া অতি সহজেই উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হয়।

উপরোক্ত দুইটী মানসিক গুণব্যতীত কর্ম্মকর্ত্তার আরও কয়েকটী গুণ থাকা আবশ্যক। নিম্নে এই শ্রেণীর কয়েকটী গুণের লক্ষণ অতিসংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল ঃ—

১। ধারণা; ইহা দুইপ্রকার হইতে পারে, (১) প্রবৃত্তি-মূলা, (২) স্বাভাবিকী। নিজপ্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া কোন কার্য্যে অভিনিবেশ স্থাপন করার নাম প্রবৃত্তিমূলা ধারণা; এবং অকস্মাৎ কোন কার্য্যের রমণীয়তা দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া তাহাতে মনোনিবেশ করার নাম স্বাভাবিকী ধারণা। স্বাভাবিকী ধারণার কার্য্যে অতি সহজেই আমাদের অভিনিবেশ স্থাপিত হয়, কিন্তু প্রবৃত্তিমূলা ধারণায় আমরা ততটা সহজে মনোনিবেশ করিতে পারি না। আবার স্বভাবিকী ধারণার কার্য্য কেবল রুচিকর;

কিন্তু প্রবৃত্তিমূলাধারণার কার্য্য দুইরূপ, (১) রুচিকর, (২) অরুচিকর। যে সমুদয় কার্য্য রুচিকর, তাহাতে অপেক্ষাকৃত অল্লায়াসে একাগ্রতা জন্মে; কিন্তু যাহা অরুচিকর, তাহাতে এইরূপ অনায়াসে একাগ্রতা জন্মে না, এবং সেই কার্য্যও সহজে সুসম্পন্ন হয় না। যাহার যে কার্য্য রুচিকর, তাহার সেই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা উচিত। রুচিভেদে কার্য্য বাছিয়া লওয়া উচিত হইলেও সময় সময় আমাদিগকে বাধ্য হইয়া অরুচিকর কার্য্যেও প্রবৃত্ত হইতে হয়। কার্য্যে একাগ্রতা স্থাপন করিতে না পারিলে আমাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়। অতএব অরুচিকর কার্য্যে কি উপায়ে অভিনিবেশ স্থাপন করা যায়, তাহাই দেখা যাউক। এই কার্য্য আমাদের কোন উদ্দেশ্যসাধনের উপায়, এইরূপ মনে করিয়া যে কার্য্য আরম্ভ করি, চরম-ফল না দেখিয়া তহা হইতে বিরত হইব না, এইরূপ স্থিরসঙ্কল্প হইয়া যদি সেই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই, তবে নিশ্চয়ই আমরা তাহাতে অভিনিবেশ স্থাপন করিতে পারিব।

সংশয় ও প্রমাদ এই দুইটী ধারণার অন্তরায়স্বরূপ। এই দুইটীদ্বারা সর্ব্বদা চিত্তবিক্ষেপ ঘটে। কর্ম্মকর্ত্তার এই দুইটী পরিত্যাগ করা উচিত। অনিশ্চিতজ্ঞানের নাম সংশয় অর্থাৎ 'এই কাজ করিলে ফল সিদ্ধি হইবে কি না' এইরূপ অনিশ্চিতজ্ঞানকেই আমরা সংশয় বলি। ঔদাসীন্যের নাম প্রমাদ। অধ্যবসায় দ্বারা এই ঔদাসীন্য পরিত্যাগ করিতে হয়।

২। অধ্যবসায়। এক দিন পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ নিউটন্‌কে কেহ

জিজ্ঞাসা করেন,—"আপনি কি উপায় অবলম্বন করিয়া এই সমুদয় দুরূহ অথচ অতি মহৎকার্য্য সম্পাদন করিলেন?" নিউটন উত্তরে বলিলেন, "অভ্রান্তচিন্তার বলে।" নিউটন ক্রমাগত ঐ সকল বিষয় চিন্তা করিতেন, এবং সত্য আবিষ্কৃত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহা হইতে বিরত হইতেন না। প্রাজ্ঞ নিউটনের এই উত্তরের অভ্যন্তরে অধ্যবসায়ের সংজ্ঞা নিহিত রহিয়াছে। বার বার অকৃতকার্য্য এবং বিফল-মনোরথ হইয়াও প্রারব্ধকর্ম্ম হইতে বিরত না হওয়ার নাম অধ্যবসায়। অধ্যবসায় উন্নতি লাভের প্রধান অবলম্বন; কর্ম্ম ও অধ্যবসায়ের সম্মিলন যেন মণি-কাঞ্চনের যোগ। কথিত আছে, দেবগণ মন্দরগিরি ও বাসুকির সাহায্যে সমুদ্রকে মন্থন করিয়া তাহা হইতে নয়টী রত্ন লাভ করিয়াছিলেন। আমরাও যদি কর্ম্ম ও অধ্যবসায়সাহায্যে সংসার-সমুদ্রকে মন্থন করি, তাহা হইলে ইহা হইতে অশেষ রত্ন-লাভ করিতে পারিব। বস্তুতঃ অধ্যবসায়ই কর্ম্মের প্রধান সহচর; অধ্যবসায় না থাকিলে কোনও দুষ্কর কার্য্য সম্পন্ন করা যায় না। এই অধ্যবসায় বলে বীরবর হামির চিরজীবন দেশ-বৈরীদিগের বিরুদ্ধে অসি চালনা করিয়াছিলেন, এবং পরিশেষে নানাবিধ বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া পিতৃলোকের আবাস-ভূমি চিতোর নগর অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই অধ্যবসায়ের সাহায্যে রাঠোরবীর যোধরাও মহাবিপদরাশি অতিক্রম করিয়া সুন্দর নগর পুনর্লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। অধিক দৃষ্টান্তের আবশ্যক নাই, ইতিহাস আলোচনা করিলে উপলব্ধি হইবে যে, অধ্যবসায়ের

সাহায্য বিনা কেহই এজগতে উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হন নাই।

৩। সাধুতা। কণিকমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে কখনও অভীষ্টলাভ হয় না; মিথ্যা, কাপট্য, শঠতা প্রভৃতির আশ্রয় অবলম্বন কদাপি মঙ্গল দায়ক নহে। কখনও কোন অবস্থায় মিথ্যা আচরণ করা উচিত নহে; মিথ্যা কথা বলিয়া ব্যক্তিবিশেষকে প্রতারণা করিলে ঐ মিথ্যা কখনও অজ্ঞাত থাকিবে না এবং ইহা প্রকাশ হইয়া পড়িলে আর কস্মিন্‌কালেও কেহ তোমাকে বিশ্বাস করিবে না। মিথ্যাকথা দ্বারা যে কেবল নিজের অনিষ্ট সাধিত হয়, এমন নহে, ইহা জগতেরও ঘোর অনিষ্টের কারণ হইয়া উঠে। এই কর্ম্মক্ষেত্রে প্রত্যেক মনুষ্যকে অন্যের সাহায্যের উপর অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতে হয়। এক জন মনুষ্যকে যদি নিজের উপজীব্য সমুদয় বস্তু নিজে উৎপন্ন করিতে হইত, তবে তাহার এই সংসারে বসতি করাই অসম্ভব হইয়া উঠিত। এই জন্যই আমাদের মধ্যে তন্তুবায় ও কৃষিজীবী প্রভৃতি নানাবিধ বর্ণবিভাগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কৃষিজীবীর বস্ত্রের প্রয়োজন হইলে তন্তুবায়ের নিকট হইতে ইহা ক্রয় করিতেছে, তন্তুবায়ের ধান্যের আবশ্যক হইলে কৃষিজীবীর নিকট হইতে ইহা ক্রয় করিতেছে। তন্তুবায়ের বিশ্বাস, সে কৃষকের দ্বারা প্রতারিত হইবে না; কৃষকের বিশ্বাস, সে তন্তুবায়ের দ্বারা প্রতারিত হইবে না। এইরূপ বিশ্বাসের উপরই জগৎ চলিতেছে। এই বিশ্বাসের মূল সাধুতা; সুতরাং সাধুতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সর্ব্বদা যত্নশীল থাকা কর্ত্তব্য।

৪। উৎসাহ। উৎসাহ অন্ধের যষ্টি, রাজার প্রধান অমাত্য ও ছাত্রের প্রধান অধ্যাপক। যাহার উৎসাহ নাই, তাহার আত্মার স্ফূর্ত্তি থাকিতে পারে না, যাহার আত্মা স্ফূর্ত্তি হীন, সে ক্রমে নিশ্চল ও নিশ্চেষ্ট হইয়া জড়প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে যাহার উৎসাহ আছে, গ্লানি কখনই তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে না; কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে তাহার হৃদয় উৎসাহে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। একটী দৃষ্টান্ত বলি। বীরকেশরী প্রতাপসিংহ হল্‌দিঘাটের যুদ্ধের পর স্বীয় তনয়ার দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া সম্রাট্ আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া তৎসমীপে একখানি পত্র প্রেরণ করেন। আকবর পত্রখানি পাইয়াই আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। অচিরে একটী সভা আহূত হইল এবং সর্ব্বসমক্ষে প্রতাপের সেই পত্রখানি পঠিত হইল। সভাস্থলে তেজস্বী পৃথ্বীরাজ উপস্থিত ছিলেন; তিনি প্রতাপের ঈদৃশ মনোবিকার দেখিয়া তাঁহার নিকট একখানি উৎসাহ পূর্ণ উদ্দীপক পত্র লেখেন। প্রতাপ পৃথ্বীরাজের সেই পত্রখানি পাইয়া পূর্ব্বসঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন এবং নব-উৎসাহে পুনরায় কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া কলম্বীর ও উদয়পুর পুনরুদ্ধার করেন। যদি পৃথ্বীরাজ "আকবর সকলকেই কিনিয়াছেন, কেবল উদয়ের পুত্রকে কিনিতে পারেন নাই," ইত্যাদি উৎসাহপূর্ণ বাক্য না বলিতেন, এবং পুণ্যশ্লোক প্রতাপও সেই উৎসাহ হৃদয়ে ধারণ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত না হইতেন, তবে সম্ভবতঃ হল্‌দিঘাটের সঙ্গেই কলম্বীর ও উদয়পুরের

সৌভাগ্যসূর্য্য অস্তমিত হইত। বস্তুতঃ প্রত্যেক কাজেই উৎসাহ থাকা আবশ্যক। উৎসাহ নির্জীবকে সজীব করে, হৃদয় মনকে নববলে বলীয়ান করে। উৎসাহশীল মানব চিরযৌবন সম্পন্ন; জরা আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে না। কিন্তু উৎসাহহীন মানব যৌবনে জরাভারগ্রস্ত। ইংলণ্ড, আমেরিকা ও জাপানের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে তত্তদ্দেশীয় নরনারীর হৃদয়ে উৎসাহবহ্নি তাহাদের প্রতিকার্য্যে কিরূপে প্রভাবিস্তার করিতেছে! আমাদের সে উৎসাহ নাই, তাই আমরা আজ জগতের এক কোণে জড়ভাবে পড়িয়া আছি।

৫। সাহস। সংসারে উন্নতি লাভ করিতে হইলে উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে সাহস থাকাও প্রয়োজন। যদি কার্য্যের কঠোরতা বা দুঃসাধ্যতা দেখিয়া ভীত হইয়া সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে সকল আশাই নির্ম্মূল হইয়া পড়িবে। তখন সাহস থাকা আবশ্যক, এই সাহসে ভর করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিলে নিশ্চয়ই সুফল ফলিবে। কখন কখন সাহস সাক্ষাৎসম্বন্ধে বিষময় ফল উৎপাদন করিতে দেখা যায় সত্য, কিন্তু এইরূপ কুফলের জনয়িতা সাহস নহে, অপরিণামদর্শিতা বা হঠকারিতা। যাহারা অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদিগকে হঠকারী কহে। মনে কর তোমার একজন বন্ধু আছেন; কোন দুষ্ট লোক এক দিবস তোমাকে বলিল, "তোমার বন্ধু অত্যন্ত আত্মম্ভরি; নিজের বিশেষ কোন স্বার্থ সাধনের অভিপ্রায়ে তোমার সহিত কপটবন্ধুতায় আবদ্ধ হইয়াছেন।" এই

কথা সত্য কি মিথ্যা, ইহার তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত না হইয়া তুমি যদি নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে ইহাই বিশ্বাস কর, এবং এই বিশ্বাসে প্রণোদিত হইয়া বন্ধুকে পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে তোমাকে হঠকারী বলা যাইবে। হঠকারী ফলাফলের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, এবং অনেক সময় ইহার কুফল দেখিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে কার্য্য হইতে বিরত হয়।

৬। ধৈর্য্য। যখন কোন অভিনব কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা যায়, তখন দুষ্ট ও উদ্যমহীন ব্যক্তি প্রায়ই বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গোক্তি করিয়া থাকে। এবম্বিধ আত্যন্তিক বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গোক্তির ফলে অনেকেরই উদ্যম ও উৎসাহ শিথিল হইয়া পড়ে, সুতরাং তাহারা আর কর্ম্মে অগ্রসর হইতে পারে না। দুষ্ট ব্যক্তির বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গোক্তিতে উপেক্ষা প্রদর্শন করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। যিনি তাহাতে কর্ণপাত করেন, তিনি নিশ্চয়ই নিজ সৌভাগ্য-পথে কণ্টক রোপণ করেন। কোন অভিনব কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে যদি কেহ তিরস্কার করে, তবে তাহাতে ক্রুদ্ধ না হইয়া ধৈর্য্য ধারণ পূর্ব্বক তাহার বাক্যে অবহেলা প্রদর্শন করা উচিত। রাজা যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীষ্মদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—"পিতামহ, মৃদুস্বভাব বিদ্বান্ ব্যক্তি মূর্খ কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইলে কিপ্রকার ব্যবহার করিবেন?" ভীষ্মদেব উত্তর করিলেন, "ধর্ম্মরাজ! যদি কোন দুষ্ট ব্যক্তি টিট্টিভের ন্যায় রুক্ষস্বরে তিরস্কার করে, তবে তাহাতে উপেক্ষা প্রদর্শন বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্ত্তব্য। কানন মধ্যে বায়সের বৃথা চিৎকারের

ন্যায় ইতর লোকের নিন্দা বা প্রশংসায় মহতের কিছুমাত্র লাভ বা ক্ষতি হয় না।"

৭। নম্রতা। কর্ম্মকর্ত্তার এই গুণটী থাকাও অতীব আবশ্যক; সুমধুর বাক্য প্রয়োগ করিয়া লোকের সর্ব্বস্ব গ্রহণ করিলেও সে নম্রতাগুণে বশীভূত হইয়া থাকে। নম্রতার অনেক গুণ আছে। নম্র প্রকৃতির লোক সকলেরই মিত্র, জগৎ তাহার বন্ধু, সুতরাং শত্রু হইতে তাহাকে আর ভীত হইতে হয় না।

৮। আত্মনির্ভর। উৎকৃষ্টতম মনুষ্যজীবন লাভ করিয়া যাহারা ইহাকে কেবল আলস্য ও বিলাসিতায় নষ্ট করিতে ইচ্ছা না করে, আত্মনির্ভরের ভাব সর্ব্বদা তাহাদের মনে থাকা কর্ত্তব্য। কিন্তু অতীব দুঃখের যে, বিষয় আমাদের দেশে এই ভাবটী তিরোহিতপ্রায় হইয়া গিয়াছে। অধিকাংশ লোকই পরমুখাপেক্ষী ও পরের হস্তের ক্রীড়া-কন্দুক। কেবল পরকীয় বুদ্ধিদ্বারা চালিত হইলে প্রায়ই প্রতারিত হইতে হয়। সংসার স্বার্থের দাস; যাহাতে নিজের কোন বিশেষ অভীষ্টসিদ্ধি হয়, অনেকেই এইরূপ পরামর্শ প্রদান করিয়া থাকেন। যাহারা প্রকৃত হিতৈষী, অর্থাৎ যাহারা যথার্থই তোমার দুঃখে দুঃখী ও তোমার সুখে সুখী; সত্যই যাহাদের হৃদয় তোমার উন্নতিদর্শনে আনন্দে উৎফুল্ল হয় ও অবনতিদর্শনে বিষাদে পরিপূর্ণ হয়, তাহাদের পরামর্শ গ্রহণ করা সঙ্গত। কিন্তু এবম্বিধ প্রকৃত হিতৈষী বাছিয়া লওয়া বড়ই সূক্ষ্ম-জ্ঞানসাপেক্ষ; সুতরাং যথাসাধ্য নিজের বিচারশক্তির উপর নির্ভর করিয়াই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা কর্ত্তব্য।

আমাদের মধ্যে একদল লোক আছেন যাঁহারা কেবল অন্যের উপর স্বীয় জীবনভার অর্পণ করিয়া নিশ্চল ও নিশ্চেষ্টভাবে সময় অতিবাহিত করিতে থাকেন। বস্তুতঃ এই আত্মনির্ভরের অভাবই আমাদের অধঃপতনের মূলীভূত কারণ, এবং এই আত্মনির্ভরের সদ্ভাববশতই ইংলণ্ডের এত শ্রীবৃদ্ধি।

আত্মনির্ভর হইতে সহিষ্ণুতা উপজাত হয়, এবং সহিষ্ণুতাই ধৈর্য্য, ক্ষমা প্রভৃতি অন্যান্য সদ্গুণের আধারস্বরূপা; সুতরাং আত্মনির্ভর যে উন্নতিলাভের একটী মুখ্যতম কারণ তৎসম্বন্ধে কোন সংশয় নাই। কোটারাজপ্রতিনিধি জালিম সিংহ এই আত্মনির্ভরের বলেই অশেষ বিপদ অতিক্রম করত কোটারাজ্যে নিজ আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কেহ কেহ দরিদ্রের কুটীরে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং অভাবের ক্রোড়ে লালিত হইয়া কেবল আত্মনির্ভরের বলে নানাবিধগুণে বিভূষিত হইয়া জগতে বরণীয় হইয়া গিয়াছেন।

আত্মনির্ভরের অভাবে অলসতা আসিয়া হৃদয় মনকে অধিকার করে, এবং এই অলসতা হইতে বিলাসিতা উৎপন্ন হয়, যখন এই তিনটীর একত্র সমাবেশ হয়, তখনই অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। যখন "জগদ্গুরু" আকবর ভারতবর্ষে আপনার আধিপত্য শনৈঃ শনৈঃ বিস্তার করিতেছিলেন, তখন মিবারাধিপতি উদয়সিংহ কেবল বিলাস-লালসার পরিতৃপ্তি-সাধনেই ব্যগ্র ছিলেন; তাঁহার বিলাসিতা ও অলসতাই চিতোরের অধঃপতনের প্রধান কারণ। শিশোদীয় কুলের যে গৌরব কেহই সমূলে ধ্বংস করিতে পারেন

নাই, মিবারের যে গৌরব শত শত বিঘ্ন বিপত্তির সময়েও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছিল, তাহা দুর্ভাগ্য উদয়সিংহের বিলাসিতা ও অলসতার জন্যই পর্য্যুদস্ত হইয়া পড়ে।

অলসতা অশেষ দোষের আকর, অলস ব্যক্তি যে কেবল নিজের সৌভাগ্য নষ্ট করে, এমন নহে, সে অন্যেরও অনিষ্ট-সাধনের একটী কারণ হইয়া উঠে। সুকবি ৺বঙ্কিমচন্দ্র যাথার্থই বলিয়াছেন, "আলস্য সংক্রামক পীড়ার ন্যায়। যে ব্যক্তি একবার এইব্যাধিগ্রস্ত হয়, সে যে কেবল নিজেই ইহার ফল ভোগ করে এমন নহে; কিন্তু সে শত শত ব্যক্তির হৃদয়ের পবিত্র সজীব ভাব সকল বিনষ্ট করিবার যন্ত্রস্বরূপ হইয়া উঠে। ইহা কীটের ন্যায় মনুষ্য-হৃদয়ের সাধুবৃত্তি সকল ক্রমে বিনষ্ট করিতে থাকে। ইহা বালক বৃদ্ধ যুবা সকলের পক্ষেই কালান্তক যমস্বরূপ।" অলস ব্যক্তির অনেক সময়ে জীবন পর্য্যন্ত সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠে। অলসতা হইতে উদরের পীড়া উপজাত হয়, এবং অনেক সময় এই উদরের পীড়াই জীবননাশের মূলীভূত কারণ হইয়া পড়ে। অতএব শরীর ধারণের জন্য পরিশ্রম আবশ্যক। কিন্তু অতিরিক্ত পরিশ্রমও ভাল নহে; অতিরিক্ত পরিশ্রমেও শরীরে নানাবিধ পীড়া উপস্থিত হইবার সম্ভব। যাহারা সর্ব্বদা নিয়মিতরূপে পরিশ্রম করে এবং পরিশ্র-মের উপযোগী আহার করে, তাহারাই সুস্থশরীরে দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে আত্মনির্ভরের অসদ্ভাব আমাদের

অলসতার একটী মূলীভূত কারণ; ইহা ব্যতীত অলসতার আরও কয়েকটী কারণ আছে, তন্মধ্যে একটীমাত্র আমরা এই স্থলে উল্লেখ করিব। আমাদের দেশে অনেকের মুখে "অদৃষ্ট" এই একটী কথা প্রায়ই শ্রুত হইয়া থাকে; এই "অদৃষ্ট" অলসতার অন্যতম কারণ। এই "অদৃষ্টের" উপর নির্ভর করিয়াই আমরা দিন দিন আরও অলস ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িতেছি। "কপালে যাহা আছে তাহাই ঘটিবে।" এইরূপ ভাবিয়া আমরা সময় সময় কার্য্যের অনুষ্ঠানে বিরত হই। যে ব্যক্তি পরিশ্রম ও চেষ্টাশূন্য হইয়া কেবল "অদৃষ্টের" উপর নির্ভর করে, সে নিতান্ত দুর্ব্বুদ্ধি। জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কোন অবস্থায়ই অদৃষ্টের উপর নির্ভর করেন না, তাঁহারা পুরুষকারকেই অবলম্বন-যষ্টি-স্বরূপ ধারণ করেন। যখন যথাবিধি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াও বিশেষ কোন নিগূঢ় কারণবশতঃ আমরা মনোমত ফললাভে বঞ্চিত হই, তখন "ভাগ্যং ফলতি সর্ব্বত্র" এইরূপ ভাবিয়া মনকে প্রবোধ দেওয়া মন্দ নহে; কিন্তু অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া পূর্ব্ব হইতেই কার্য্যানুষ্ঠানে বিরত হওয়া কেবল মূঢ়তার লক্ষণ মাত্র। কেহ কেহ কর্ম্মফলের অনিশ্চয়ত্ব চিন্তা করিয়া কার্য্যানুষ্ঠানে বিরত হয়। কিন্তু এইরূপ করিয়া তাহারা কেবল নিজেরই সর্ব্বনাশসাধন করে। "পশ্চাৎ কি জানি কর্ম্ম সফল না হয়" এইরূপ সন্দেহই বিশেষ অনিষ্টের মূল। কর্ম্মারম্ভের পূর্ব্বেই যদি অনিশ্চয়ত্ব-সম্ভাবনা করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকা যায়, তবে আর সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা কোথায়? কিন্তু যদি ইহার নিশ্চয়ত্ব ভাবিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তবে

কোন বিশেষ কারণে ফল লাভ করিতে না পারিলেও কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছি ভাবিয়া আর মনে আত্মগ্লানি উপস্থিত হয় না। আমি নিতান্ত অক্ষম, এইরূপ ভাবিয়াও নিশ্চেষ্ট থাকা কর্ত্তব্য নহে; এইরূপ করিলে কস্মিন্-কালেও উন্নতি লাভ করিতে পারিবে না। অসন্দিগ্ধচিত্তে এবং যত্ন ও পরিশ্রমসহকারে কার্য্য করিলে শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক, অবশ্যই তাহার ফল লাভ হইবেক।

বালক ও বালিকাগণ! যিনি তোমাদিগকে কর্ম্মশক্তি প্রদান করিয়া সংসারে প্রেরণ করিয়াছেন, যদি তোমরা এই শক্তি সৎকর্ম্মে প্রয়োগ না কর, তবে তিনি অসন্তুষ্ট হইবেন; যখন কর্ম্ম করিবার জন্যই সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর কর্ত্তৃক এই ধরাধামে প্রেরিত হইয়াছ, তখন কর্ম্মেই নিজ শক্তি নিয়োজিত কর। যদি তোমরা নিশ্চেষ্ট হইয়া আলস্যে কালক্ষেপ কর, তবে তোমাদিগকে সর্ব্বত্রই পরাভূত হইতে হইবে। সংশয়শূন্য কর্ম্ম-নিরত ধীর ব্যক্তির পথ অনুসরণ কর, অবশ্যই ইহসংসারে সুখে কাল যাপন করিতে পারিবে। শত সহস্র বিঘ্নবিপত্তি আসিয়া উপস্থিত হউক, তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিও না, কর্ম্মমূলকে দৃঢ়রূপে অবলম্বন কর, অতি দুষ্কর কার্য্যও সহজ বলিয়া বোধ হইবে এবং সময়ে তোমরা কর্ম্ম করিতে এত অভ্যস্ত হইয়া উঠিবে যে, আর ক্ষণমাত্রও আলস্যে অতিবাহিত করিতে ইচ্ছা হইবে না।

একটুকু অনুসন্ধান করিলেই দেখিতে পাইবে যে, তোমাদের মধ্যেই অনেক মহাত্মা সমস্ত দিন অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া যে

অল্প সময়টুকু পান, তাহাও সাহিত্যালোচনায় অতিবাহিত করেন। আলস্যে কালক্ষেপ করিতে তাঁহাদের কিছুমাত্র প্রবৃত্তি হয় না; এই সাহিত্য আলোচনাই তাঁহাদের জীবনের একপ্রকার বিশ্রাম সময়। সুকবি বঙ্কিম চন্দ্র, হেম চন্দ্র, ও নবীন চন্দ্র প্রভৃতির জীবনীর বিষয় যাহারা বিশেষরূপে অবগত আছ, তাহারাই ইহার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারিবে। অতএব সৎ-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও, নিজের মঙ্গল হইবে, জগতের মঙ্গল হইবে।

সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্য।

একটী গল্প আছে, এক সময়ে উজ্জয়িনীপতি রাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্যের সহিত তাঁহার গুণ-গ্রামের বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। গুণেরা অহঙ্কার করিয়া বলে,—"মহারাজ, আমরাই আপনার বল।" রাজা বলিলেন,—তোমাদের এ অহঙ্কার বৃথা, একমাত্র "সহিষ্ণুতাই আমার বল।" পরীক্ষার জন্য রাজা তাহাদিগকে একে একে বিদায় দিলেন। শান্তি, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা প্রভৃতি সকলই গেল; অবশেষে রাজ-লক্ষ্মীও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর সহিষ্ণুতা-দেবী রাজার নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে আসিলেন; রাজা তাঁহাকে বিদায় দিলেন না, বলিলেন, —"মাতঃ! আমি তোমাকেমাত্র অবলম্বন করিয়া রহিয়াছি, তুমি আমাকে ত্যাগ করিতে পারিবে না।" সহিষ্ণুতা রহিলেন, কিন্তু অবশেষে যাবতীয় গুণগ্রাম বিক্রমাদিত্যের আশ্রয়ে থাকিতে বাধ্য হইল।

বস্তুতঃ সহিষ্ণুতা অন্যান্য সৎপ্রবৃত্তির উৎসস্বরূপ। ইহা আত্ম-সংযম, আত্মত্যাগ, ক্ষমা, দৃঢ়তা প্রভৃতি গুণ-নিচয়ের আশ্রয় স্থল। যে স্থলে সহিষ্ণুতার অভাব, সেই স্থলে আত্ম-সংযম প্রভৃতি গুণাবলিরও অভাব পরিলক্ষিত হয়। সহনশীলতার সহিত এই সকল গুণের অচ্ছেদ্য-সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধ কিরূপ, তাহা দেখা যাউক।

আত্ম-সংযম। মানুষের মন প্রায় সর্ব্বদাই কোন না কোন চিন্তায় অভিভূত থাকে। কাহারও কাহারও মন অতি সাধু ভাবে পূর্ণ থাকে, আবার কাহারও কাহারও মন কেবল অসাধু চিন্তায় ব্যাপৃত থাকে। কেহ কেহ এত সন্দিগ্ধচেতাঃ যে, অকারণ অন্যকে সন্দেহ করিয়া কেবল তৎসম্বন্ধীয় চিন্তাতেই স্বীয় মস্তিষ্ক বিলোড়িত করে; আবার কেহ কেহ এত জিগীষাপরতন্ত্র যে সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে জিগীষার পরিতৃপ্তিসাধন করিতে অক্ষম হইয়া পরোক্ষে বা মনে মনে গালি গালাজ করিয়া স্বীয় প্রতিশোধ পিপাসার শান্তি-বিধান করে। অনেক সময়ে যখন উহাদের মনের উদ্বেগ খুব প্রবল হইয়া উঠে, তখন মনের ভাবগুলি অজ্ঞাতসারে কথায় প্রকাশ হইয়া পড়ে। একটু অনুসন্ধান করিলেই এইরূপ ঘটনা অনেক স্থলে প্রত্যক্ষীভূত হয়। এরূপ প্রকৃতির লোক সময় সময় অন্যমনস্ক ও বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া অভিনব ভাবে মস্তক নাড়িতে ও ক্রোধে দুর্ব্বাসা সাজিয়া হস্তপদাদি সঞ্চালন করিতে দেখা যায়। এইরূপে পথেঘাটে নাট্যাভিনয় করিয়া তাহারা কেবল উপহাসাস্পদ হয়। যদি তাহাদের আত্মাকে সংযত রাখিবার সামান্যমাত্রও ক্ষমতা থাকে, তবে আর তাহাদিগকে এইরূপ অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইতে হয় না। আত্ম-সংযমের অভাবই তাহাদের এই লাঞ্ছনার কারণ। এইরূপে সর্ব্বদা কুচিন্তার প্রশ্রয় দিয়া তাহারা স্ব স্ব মস্তিষ্ক বিকৃত করিয়া তুলে, পরে আর কোন মহৎ বিষয়ে তাহাদের মনোনিবেশ হয় না।

যদি সহিষ্ণুতা না থাকে তবে আত্ম-সংযম করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। অন্যে কোন কটূক্তি করিলে তাহা উপেক্ষা করিতে হইবে। তাহা যদি না কর, তবে ইহার প্রতিশোধ নিতেই তুমি সর্ব্বদা যত্নশীল থাকিবে, এবং নানাবিধ কুচিন্তা ও কুকল্পনার প্রশ্রয় দিয়া আত্মাকে কলুষিত করিবে। সুতরাং এই সকল কুভাব মন হইতে দূর করিতে হইলে সংযতাত্মা হইতে হইবে। আত্ম-সংস্কারের ইহা একটী মহৎ অঙ্গ।

আত্ম-ত্যাগ। আত্মত্যাগের সহিত সহিষ্ণুতার কিছু দূর সম্পর্ক, পরার্থে নিজের স্বার্থ উৎসর্গ করার নাম আত্মত্যাগ। আত্ম-ত্যাগ ভালবাসা হইতে উৎপন্ন হয়। ভালবাসার ক্ষেত্র যখন অতিশয় প্রশস্ত হইয়া পড়ে, যখন আমরা অন্যকে ভাল-বাসিতে শিক্ষা করি, তখনই আমরা অন্যের জন্য আত্ম-ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হই। কিন্তু অন্যকে ভালবাসিতে হইলে সময়ে সময়ে তাহার দোষ ক্ষমা করিতে হয়। সুতরাং ভালবাসার ক্ষেত্র খুব প্রশস্ত করিতে গেলে ক্ষমাগুণ থাকা আবশ্যক। এই ক্ষমা-গুণের সহিত সহিষ্ণুতার নিকট সম্বন্ধ, সুতরাং আত্ম-ত্যাগের সহিতও সহিষ্ণুতার সম্বন্ধ বিদ্যমান আছে।

দৃঢ়তা। শত বিঘ্ন উপস্থিত হইলেও সঙ্কল্পপরিত্যাগ না করার নাম দৃঢ়তা বা স্থির-প্রতিজ্ঞতা। সহিষ্ণুতার সহিত এই গুণের অতি নিকট সম্বন্ধ। যদি সহ্য করিবার শক্তি না থাকে, তবে ইহাও থাকিতে পারে না। দৃঢ়তা সহিষ্ণুতার অন্তর্ভুক্ত সহিষ্ণুতার অভাবে দৃঢ়তারও অভাব হয়। সুতরাং এই গুণে

অলঙ্কৃত হইতে হইলে সহনশীল হওয়া আবশ্যক। সঙ্কল্প-কবচে হৃদয়কে আচ্ছাদন করিতে হইলে সহিষ্ণু হইতে হইবে, দৃঢ়তার পরিখায় হৃদয় মনকে বেষ্টন করিতে হইবে। যাহারা সহিষ্ণু, সামান্য প্রতিঘাতে যাহাদের হৃদয় বিচলিত হয় না, সঙ্কল্প-সিদ্ধি তাহাদের পক্ষে বড় কঠিন ব্যাপার নহে। এই শক্তি বিদ্যমান ছিল বলিয়াই ধ্রুব, প্রহ্লাদ, বুদ্ধদেব ও চৈতন্যদেব প্রভৃতি ধর্ম্মবীরগণ নানাবিধ বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া স্ব স্ব মনোরথ সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সহিষ্ণুতা ছিল বলিয়াই প্রতাপ, সমর প্রভৃতি জগৎপূজ্য মহাত্মগণ সুমেরুর ন্যায় অচল ও অটল ভাবে সঙ্কল্প-সাধনে প্রবৃত্ত ছিলেন। বস্তুতঃ স্থির-প্রতিজ্ঞ না হইলে কোন কার্য্যই সুসিদ্ধ হয় না। অস্থিরপ্রকৃতি লোকের মন ক্ষণ-পরিবর্ত্তনশীল। অতি সহজেই উহা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। প্রাতঃস্মরণীয় শ্রীযুক্ত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরে এই দৃঢ়তা-গুণ সম্যক পরিস্ফুরিত হইয়াছিল। তিনি যে কাজে হাত দিতেন, তাহা সমাধা না করিয়া কখনই তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইতেন না। তিনি সমাজ-সংস্কারে হস্তক্ষেপ করিয়া পদে পদে বিড়ম্বিত ও বিপন্ন হইয়াছেন, অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন এবং সময় সময় অজস্র অর্থব্যয়ে একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু দৃঢ়তা-গুণে এই সকল বাধাবিঘ্ন অম্লানবদনে সহ্য করিয়া জগৎসমক্ষে এক উচ্চ আদর্শ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

ক্ষমা। সহিষ্ণুতা না থাকিলে ক্ষমাগুণও থাকিতে পারে না; সহিষ্ণুতা ক্ষমার চির সহচরী, যেখানে ক্ষমা, সেই-

খানে সহিষ্ণুতা ; ক্ষমার চতুর্দ্দিকে সহিষ্ণুতার বাঁধ, যে দিন সেই বাঁধ ভাঙ্গিবে, সেই দিন ক্ষমা অনন্তসাগরে বিলীন হইবে। যদি সহন-শক্তি না থাকে, তবে অন্যকে ক্ষমা করা দূরে থাকুক, তৎকৃত অপকারের প্রতিশোধ দিবার জন্য মন উদ্বিগ্ন হইয়া উঠে। ক্ষমা-গুণের একটী মোহিনী শক্তি আছে ; সে শক্তি অপার, অনন্ত ও ঐশ্বরিক। যদি কেহ আমাদের অপকার করে, এবং আমরা শক্তিসত্ত্বেও কোনরূপ শাস্তি না দিয়া তাহাকে ক্ষমা করি, তবে সে নিজের নীচাশয়তা ও ক্ষমীর উদারতা দেখিয়া আপনাকে শত ধিক্কার দিবে এবং অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া চরিত্রসংশোধন করিতে প্রবৃত্ত হইবে। পাপীর চরিত্রসংশোধনের ইহা একটী প্রকৃষ্ট উপায়। দৃষ্টান্তস্থলে নিত্যানন্দ ও জগাই মাধাইর কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। নিত্যানন্দ প্রেমিক, জগতে প্রেমশিক্ষা দেওয়াই তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল। একদা পাষণ্ড মদ্যপায়ী জগাই মাধাই নিত্যানন্দকে পথিমধ্যে পাইয়া গুরুতররূপে আঘাত করে। দয়াল নিত্যানন্দ সেই আঘাতের 'আশ্চর্য্য প্রতিঘাত' করিলেন। তিনি আহত হইয়া বলিলেন, "ভাই জগাই, মাধাই! আমাকে আহত করিয়াছ, ভালই হইয়াছে ; এখন উভয়ে হরিবলে নাচ।" নিত্যানন্দের সেই আশ্চর্য্য উদারতা দেখিয়া, পাষণ্ডদ্বয়ের হৃদয় গলিয়া গেল। তাহারা নিত্যানন্দের চরণে ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল এবং সেই অবধি হরিভক্ত বৈষ্ণব সাজিয়া হরিগুণ গান করিতে করিতে জীবনের অবশিষ্টসময় অতিবাহিত করিল। কঠোরতম শাস্তি দ্বারাও যাহা সাধিত

হইত না, একমাত্র ক্ষমাপ্রদর্শনে তাহা অনায়াসে সুসিদ্ধ হইল।

ক্ষমাগুণ মানুষকে দেবতুল্য করে। যিনি এই গুণের বশীভূত, জগৎ তাঁহার বশীভূত। ইতিহাসের আলোচনা করিলেই জানা যায়, যে সকল ধর্ম্মবীর অবতীর্ণ হইয়া এই পৃথিবী পবিত্র করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই ক্ষমাগুণ অতিমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। মহাভারত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ভৃগু-মুনি ক্রোধপরবশ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে পদাঘাত করেন, তিতিক্ষু কৃষ্ণ পদাহত হইয়াও মুনিকে বলিলেন,—"মহাত্মন্, আমার কঠোরবক্ষে আঘাত করিয়া আপনার শ্রীচরণই ব্যথিত হইয়াছে, অতএব অপরাধ ক্ষমা করিবেন।" পুরোহিতগণ হিরণ্যকশিপু-কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া ভক্তপ্রবর স্থিরমতি প্রহ্লাদের বিনাশসাধনের জন্য অভিচার-ক্রিয়া আরম্ভ করেন, কিন্তু 'অভিচার' তৎপরিবর্ত্তে পুরোহিতগণেরই বিনাশসাধন করে। প্রহ্লাদ তখন শত্রুনাশ হইয়াছে ভাবিয়া কিছুমাত্র সন্তুষ্ট না হইয়া. সেই সকল পুরোহিতের জন্য জগদ্‌গুরু বিষ্ণুকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন; ব্রাহ্মণ-গণকে দুঃসহ মন্ত্রাগ্নি হইতে রক্ষা করিবার জন্য জনার্দ্দনের স্তুতি আরম্ভ করিলেন। সাধু হরিদাস মুসলমানধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যখন হিন্দু হইলেন, তখন মুসলমান কাজি মুলুকপতি, তাঁহাকে বাজারে বাজারে ঘুরাইয়া বেত্রাঘাতে প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। এই কঠোর আদেশের ভয়ে হরিদাস হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিবেন, ইহাই কাজির ধারণা ছিল, এবং এই ধারণাবলে মুলুকপতির মন্ত্রী

গোরাই কাজি হরিদাসকে বলিলেন, "তুমি যদি হরিনাম ছাড়িয়া কল্‌মা পড়, তবে তোমাকে বিশেষভাবে পুরস্কৃত করা যাইবে।" হরিদাস এই কথা শুনিয়া নির্ভীকভাবে উত্তর দিলেন—

"খণ্ড খণ্ড হয়ে যদি যায় মম প্রাণ।
তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম॥"

হরিদাসের এই উত্তরে কাজি অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহাকে বাজারে বাজারে লইয়া গিয়া বেত্রাঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু সাধু হরিদাস কি করিলেন? তাঁহাকে বেত্রাঘাত করিয়া গোরাই কাজি ও তাহার অনুচরবর্গ ঘোরপাপে লিপ্ত হইতেছে ভাবিয়া তদীয় হৃদয় ব্যথিত হইল। তাহাদের এই অপরাধ ক্ষমা করিবার জন্য তিনি শ্রীহরিকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। কেমন মহৎ ও সুন্দর চরিত্র! কেমন উদার ভাব! যাহারা তাঁহার নিজের জীবনবিনাশে সমুদ্যত ছিল, তিনি তাহাদেরই জীবনের জন্য দয়াসিন্ধু ভগবান্‌কে কায়মনোবাক্যে ডাকিতে লাগিলেন। পূর্ব্বকালে হিন্দুরাজগণ আততায়ী বন্দীকে কারামুক্ত করিয়া ক্ষমাগুণের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। রাণাকুম্ভ যখন মালবের খিলিজিরাজ মহম্মদকে বন্দী করিয়া চিতোরে আনয়ন করেন,তখন তিনি ইচ্ছা করিলেই শত্রুর প্রাণ-নাশ করিয়া ক্রোধের উপশম করিতে পারিতেন। তিনি খিলিজিরাজের প্রাণনাশ ত করিলেনই না, প্রত্যুত তাঁহাকে প্রচুর উপঢৌকন দিয়া স্বনগরে বিদায় দিলেন।

ক্ষমাগুণের অন্য একটী মহতী শক্তি আছে। ক্ষমার নিকট

ক্রোধ দাঁড়াইতে পারে না। সমুদ্রবেগ যেরূপ পর্ব্বতে সংলগ্ন হইবামাত্র প্রতিহত হয়, ক্রোধও সেইরূপ ক্ষমাতে সংলগ্ন হইবামাত্রই বিলীন হইয়া যায়।

ক্ষমা প্রকাশ করিলে যে ক্ষুদ্রাশয় ও লঘুচেতা অনুতপ্ত হয় না, তাহাকে বারংবার ক্ষমা না করাই কর্ত্তব্য; কারণ, সে ইহাতে ক্ষমাশীলকে অসমর্থ মনে করিয়া তাঁহার উপর নানারূপ অত্যাচার ও উৎপীড়ন আরম্ভ করে এবং সুবিধা পাইলেই তাঁহার স্কন্ধে উঠিবার চেষ্টা করে।

ক্রমানুশীলনদ্বারা যখন সহিষ্ণুতা পূর্ণবিকসিত হয়, তখনই হৃদয়ে ধৈর্য্য-গুণের আবির্ভাব হয়। যে গুণ থাকিলে বিকারের যথেষ্ট কারণ থাকা সত্ত্বেও মনে কোনরূপ বিকার উপস্থিত হয় না, তাহাকেই ধৈর্য্য-গুণ বলে। মনে কর, আজ তুমি ঘোর-সঙ্কটে পতিত, সহায়সম্পদ্‌হীন, আত্মীয়কুটুম্ব তোমাকে একা ফেলিয়া এই ভবরঙ্গভূমি হইতে চিরতরে বিদায়গ্রহণ করিয়াছেন, তুমি যে দিকে দৃষ্টিপাত কর সেই দিকেই অন্ধকার; চতুর্দ্দিকেই বিভীষিকার করালমূর্ত্তি।—এইরূপ অবস্থায় তোমার বিকারের যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে; তুমি হয়ত সহজেই অস্থির হইয়া উঠিবে; অনাহারে অনিদ্রায় ও বিষময়ী চিন্তার কঠোরতম দংশনে হয়ত নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত সঙ্কটাপন্ন করিয়া তুলিবে; এইরূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় পতিত হইলেও হৃদয়ের শান্তি রক্ষা করা ধৈর্য্য-গুণের কার্য্য। সহিষ্ণুতা থাকিলে বিকারের ভাব চাপিয়া রাখা যায়, কিন্তু ধৈর্য্য-গুণ থাকিলে হৃদয়ে বিকার আসিতেই

পারে না। মনে ক্রোধোদয় হইলে সেই ক্রোধ দমন করিয়া রাখা সহিষ্ণুতার কার্য্য; কিন্তু কারণ বিদ্যমান থাকিলেও মনে ক্রোধোদয় না হওয়াই ধৈর্য্য-গুণের অভিব্যক্তি। সর্ব্বদা বিকারের ভাব দমন করিয়া রাখিলে ক্রমে এই ভাব মন হইতে অন্তর্হিত হয়, এবং ইহার লুপ্তাবস্থায়ই ধৈর্য্য-গুণের আবির্ভাব হয়।

মানুষ ও পশুর প্রকৃতিতে যে বিভিন্নতা আছে, ইহা ধৈর্য্য-গুণদ্বারাই অপেক্ষাকৃত অধিকপরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। মানুষের ধৈর্য্য-গুণ আছে, পশুর ধৈর্য্য-গুণ নাই; পশুজাতির যখন ক্রোধের উদ্রেক হয়, তখন তাহারা জিঘাংসাপরবশ হইয়া উঠে, ক্রোধের উপশম না হওয়া পর্য্যন্ত প্রতিহিংসা হইতে বিরত হয় না। মনুষ্যসমাজে যাহারা পশুর ন্যায় ক্রোধ-পরবশ হইয়া কার্য্য করে তাহারা পশু হইতে আরও ভয়ঙ্কর, কারণ, মানুষ যেরূপ কুটনীতির সাহায্যে তাহার জিঘাংসা-বৃত্তিকে অন্যের প্রতি নিয়োজিত করিতে পারে, পশুর পক্ষে তাহা অসম্ভব।

ধৈর্য্য চতুর্ব্বর্গের নিদান; ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিলে ধর্ম্ম, অর্থপ্রভৃতি সমুদয় অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। ধৈর্য্য আমাদের কল্পতরু, কারণ ধৈর্য্য আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি সাধন করিতে সমর্থ। আশা মানুষের প্রধান নিয়ন্ত্রী, আশায় মুগ্ধ হইয়া মানব এই ক্ষণভঙ্গুর দুর্ব্বহজীবনের ভার অম্লানবদনে সহ্য করে, আশা ফলবতী হইবার প্রধান উপায় ধৈর্য্য। রোম যখন দাসত্বশৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত হইয়াছিল, তখন যদি রোমের অধিবাসিগণ সুধীর ও শান্তভাবে কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত না হইত, তাহা হইলে রোম আবার স্বাধীন

হইবে বলিয়া তাহাদের যে আশা ছিল তাহা ফলবতী হইত না। তাহারা ধীরভাবে সুযোগের প্রতীক্ষায় রহিল এবং সুযোগ উপস্থিত হওয়ামাত্র অনন্তউদ্যোগিতার প্রভাবে জননীজন্মভূমির দাসত্বশৃঙ্খল চূর্ণ করিয়া সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করিল। ধৈর্য্য ও চেষ্টার বলে রোম আবার মস্তক উত্তোলন করিয়াছে।

কেহ কেহ ধৈর্য্যশালী ব্যক্তিকে ভীরু বলিয়া তিরস্কার করেন। ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া যখন স্বীয় কর্ত্তব্যাবধারণে চিন্তাকুল ছিলেন তৎকালে, অনেকেই তাঁহাকে ভীরু বলিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। কিন্তু তিনি কি প্রকৃতই ভীরু ছিলেন? কর্ম্ম-ক্ষেত্রে তাঁহার অসাধারণ সাহস ও বীরত্বের পরিচয় বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি ধীরভাবে কর্ত্তব্যাবধারণে সচেষ্ট ছিলেন। ইহাতে, তাঁহার হীনসাহসের বিন্দুমাত্র চিহ্ন নাই; বরং তাঁহার বীরোচিত ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও পরিণামদর্শিতা বিদ্যমান রহিয়াছে।

ধৈর্য্যের প্রতিপক্ষ কয়েকটী মানসিক বৃত্তি আছে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি ইহার অন্তর্গত। ইহারাই মানুষকে ধৈর্য্যচ্যুত করে; সুতরাং ইহাদিগকে সংযত করা আমাদের কর্ত্তব্য। ক্ষমা, দয়া প্রভৃতি সৎপ্রবৃত্তির সম্যক্ অনুশীলন করিলে ক্রোধ প্রভৃতি নিকৃষ্টবৃত্তির দমন সাধিত হয়। একের উন্নতিতে অপরের অবনতি। সৎপ্রবৃত্তি ও অসৎপ্রবৃত্তি আমাদের মনো-রাজ্যকে সমদ্বিখণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে। উভয়ের পরিসরই প্রথমতঃ সমভাবে থাকে; ক্রমে ব্যক্তিভেদে, একটী অন্যটীর উপর

আধিপত্য বিস্তার করে। অসৎপ্রবৃত্তির অনুশীলন অধিক-পরিমাণে করিলে সৎপ্রবৃত্তি স্বল্প-প্রসর হয়; পক্ষান্তরে সৎপ্রবৃত্তির অধিকপরিমাণে অনুশীলন হইলে অসৎপ্রবৃত্তি সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে; সুতরাং অসৎপ্রবৃত্তিগুলিকে সংযত করিতে হইলে, ক্ষমা ইত্যাদি সৎপ্রবৃত্তির সম্যক্ অনুশীলন আবশ্যক।

ক্রোধ দুইপ্রকার; একপ্রকার ক্রোধ তাৎকালিক, অন্য-প্রকার উত্তরকালিক। পূর্ব্বটী অবিচারিত, পরবর্ত্তীটা বিচারিত। অবিচারিত ক্রোধ সময় ও সহায়ের অপেক্ষা করে না। অবিচারিত ক্রোধে অন্ধ হইয়াই অনেক নর-পিশাচ নমস্য পিতা, করুণা-স্বরূপিণী মাতা, স্নেহময়ী বনিতার নিগ্রহ এবং অতি কঠোর-বাক্য প্রয়োগদ্বারা মাননীয় ও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির অবমাননা করে। নানাবিধ পাপের অনুষ্ঠান, গুরুজনের প্রাণবিনাশ, এবং কার্য্যাকার্য্যবিচারশূন্য হইয়া রাগান্ধবৃষভের ন্যায় স্বীয় জীবন-তরুর মূলে কুঠারাঘাত এই শ্রেণীর ক্রোধের কার্য্য। অবিচারিত ক্রোধ অতীব দোষণীয়; ইহাই মানুষকে পশুপ্রকৃতিক করিয়া তুলে। বিচারিত ক্রোধ ততটা দোষণীয় বলিয়া অনুমিত হয় না; আত্ম-রক্ষার্থ অবিকৃতমনে ক্রোধ প্রকাশ করিলে তাহা কোনরকমেই দোষণীয় হইতে পারে না। একটা গল্প বলি; একদা দেবর্ষি নারদ বৈকুণ্ঠে দেবসভায় চলিয়াছেন। পথে তাঁহার সহিত একটী সর্পের সাক্ষাৎ হইল। সর্প তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া যোড়হস্তে জিজ্ঞাসা করিল, "দেবর্ষি! মোক্ষপ্রাপ্তির উপায় কি?" দেবর্ষি উত্তরে বলিলেন, "কাহাকেও দংশন করিও না, তাহা হইলে তোমার

মুক্তি হইবে।” সর্প তাহার উপদেশ মত আর কাহাকেও দংশন করে না, জীবন্মৃতের ন্যায় কালাতিপাত করিতে লাগিল। তাহার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া রাখাল বালকগণ ঢিল নিক্ষেপ করিয়া তাহার অঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিতে লাগিল, কিন্তু সে কিছুতেই উত্তেজিত না হইয়া নিতান্তশান্তভাবে জীবনযাপন করিতে লাগিল। পরে হঠাৎ একদিবস দেবর্ষি নারদকে এই পথে যাইতে দেখিয়া সর্প তাঁহাকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া বলিল, “প্রভো!—আপনার উপদেশে আমি শান্তভাবে জীবন যাপন করিতেছি, কিন্তু রাখালবালকগণের উৎপীড়নে আমার শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, আমার প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়াছে; এখন উপায় কি?” নারদ বলিলেন—“আমি ত তোমাকে ফুস্ ফুস্ করিতে নিষেধ করি নাই; দংশন করিতেই বারণ করিয়াছি; তুমি আত্মরক্ষার্থ ফুস্ ফুস্ করিতে পার।” সর্প তাঁহার সেই উপদেশানুসারে আবশ্যকমত অবিকৃতমনে, ফুস্‌ফুস্ করিতে আরম্ভ করিল এবং তদবধি আর কেহ তাহাকে উৎপীড়ন করিতে সাহসী হইত না।

কেহ চুরি করিলে বা আমাদের সহিত প্রবঞ্চনা করিলে আমরা যে ক্রোধ প্রকাশ করি তাহাও দোষণীয় নহে, বরং সময় সময় ইহা অশিষ্টদিগকে দমন ও শিষ্টদিগকে রক্ষা করে। কিন্তু এইরূপ ক্রোধেও আমাদের শারীরিক ও মানসিক অনেক অনিষ্ট সাধিত হয়, সুতরাং ক্রোধমাত্রকেই বর্জ্জন করা কর্ত্তব্য। অত্যধিক ক্রোধের উত্তেজনায় ক্রমে শরীর ও মন দুর্ব্বল এবং ক্ষীণ হইয়া পড়ে। ক্রোধ জন্মিলে মস্তিষ্ক অত্যন্ত আলোড়িত হয়, সর্ব্ব-

শরীরে একপ্রকার আগুন ছুটিতে থাকে এবং মানসিক অন্যান্য-বৃত্তির কার্য্য একরূপ স্থগিত হইয়া পড়ে। শরীরে যে তেজঃ-প্রবাহ ছুটিতে থাকে, তাহাই তড়িৎপ্রবাহ। ক্রোধের সময় এই তড়িৎপ্রবাহ অধিকপরিমাণে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, এবং এই ক্ষয় আর কিছুতেই পূর্ণ হয় না। এইরূপ ক্ষয়হেতু শরীর ক্ষীণ ও দুর্ব্বল, মন নিস্তেজ ও উৎসাহশূন্য হইয়া পড়ে। ক্রোধ ঘৃত সংযুক্ত অগ্নির ন্যায় ক্রমশঃ বৃদ্ধিপাইতে থাকে এবং অবশেষে মানবকে উত্তেজনার অনলে পতঙ্গ-বৃত্তি অবলম্বন করায়। বেণু ও নল যেরূপ আত্মনাশের জন্য ফলপ্রসব করে এবং কর্কটী যেমন আপনার বিনাশার্থ গর্ভধারণ করে, সেইরূপ ক্রোধীও আত্ম-বিনাশার্থই ক্রোধ ধারণ করে।

ক্রোধের সময় চুপ করিয়া থাকা ক্রোধের হস্ত হইতে পরিত্রাণ-লাভের একটী প্রকৃস্ট উপায়। প্লেটো এই উপায়ে ক্রোধ দমন করিতেন। প্লেটো একদিবস নীরবে বসিয়া আছেন এমন সময়, তাঁহার একজন বন্ধু তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া চুপ্ করিয়া বসিয়া থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করেন, প্লেটো উত্তরে বলেন,—"আমি একজন ক্রুদ্ধব্যক্তির শাসন করিতেছি।" বস্তুতঃ তিনি ক্রোধের সময় কোনরূপ শাস্তিবিধান করিতেন না। ক্রোধ প্রশমিত হইলে দণ্ডবিধান করিতেন। ক্রোধের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার দ্বিতীয় উপায়, উপেক্ষা ও ক্ষমা। অগ্নি যেমন তৃণহীনস্থানে পতিত হইলে আপনিই নির্ব্বাপিত হয়, ক্রোধও সেইরূপ ক্ষমাশীল ব্যক্তির উপর আপতিত হইলে আপনিই লয়প্রাপ্ত হয়।

অতএব যাহাতে ক্ষমা ও উপেক্ষা দ্বারা ক্রোধ প্রতিহত হইতে পারে, সেইরূপ যত্নশীল হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য। ক্ষমা ও উপেক্ষা দ্বারা ক্রোধকে প্রতিহত করা অতিশয় আয়াসসাধ্য ব্যাপার, কিন্তু ইহা মনে রাখা উচিত যে, মনকে উন্নত করিতে হইলেই অনেক বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হয়। মানুষের মন সাধারণতঃ অসৎপথেই প্রধাবিত হয়, মনের এই গতির পরিবর্ত্তন করিতে হইলে পরিশ্রম ও চেষ্টা আবশ্যক।

লোভ স্বার্থ হইতে উৎপন্ন হয়, লোভ হইতে মোহ জন্মে এবং মোহে আচ্ছন্ন হইয়াই মনুষ্য দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। স্বার্থ মঙ্গলদায়ক ও অনিষ্টদায়ক উভয়ই; স্থলবিশেষে ইহা মঙ্গলসাধন আবার অন্যত্র ইহা ঘোর অনিষ্ট উৎপাদন করে। স্বার্থ সর্ব্বত্র নিন্দনীয় নহে। স্বার্থ হইতে অনুরাগ উপস্থিত হয়, এবং এই অনুরাগ হইতে কর্ত্তব্যজ্ঞানের আবির্ভাব হয়। স্বার্থে প্রণোদিত হইয়াই আমরা স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি অনুরক্ত হই; ক্রমে স্বার্থ তিরোহিত হইয়া আমাদের মনে কেবলমাত্র অনুরাগ বর্ত্তমান থাকে। বৃদ্ধবয়সে স্ত্রী ও স্বামীর মধ্যে এই অনুরাগ বিদ্যমান থাকে বলিয়াই, তাঁহারা একে অন্যের জন্য জীবনপর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। অনুরাগ স্থানবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হয়। স্ত্রী ও স্বামীর মধ্যে যে অনুরাগ তাহাকে প্রেম বলে, পুত্র ও ভ্রাতাদের প্রতি যে অনুরাগ তাহাকে স্নেহ বলে, এবং পিতা, মাতা, অন্যান্য গুরুজন ও ঈশ্বরের প্রতি যে অনুরাগ তাহাকে শ্রদ্ধা বা ভক্তি বলে।

অন্যের কোনরূপ অনিষ্ট না করিয়া, স্বার্থসাধনে প্রবৃত্ত হওয়া দোষণীয় নহে। মানুষ যদি নিজ নিজ স্বার্থসাধনে রত না থাকিত, তবে পৃথিবীর এত উন্নতি সাধিত হইত না। কিন্তু বড়ই আক্ষেপের বিষয় যে, যখন আমরা স্বার্থান্ধ হই, তখন আমাদের হিতাহিতজ্ঞান একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া যায়, আমরা অন্যের সুখ-দুঃখের প্রতি কটাক্ষও করি না। আমরা স্বার্থ-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া অতৃপ্তিকর লোভের বশবর্ত্তী হই, এবং অন্যের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া আপন আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে প্রয়াস পাই। এই প্রকারের স্বার্থই আমাদিগকে নিরয়গামী করে। যে স্বার্থ অন্যের সুখ-দুঃখের প্রতি লক্ষ্য করে না, তাহা ঘোর অনিষ্টদায়ক এবং ঈদৃশ স্বার্থসাধন নিতান্ত দোষণীয়। এইরূপ স্বার্থ হইতেই লোভ ও মোহের উৎপত্তি হয় এবং যখন এই তিনটীর একত্র সমাবেশ হয়, তখনই আমরা কেবল আত্মতুষ্টি ও আত্মোদরপূরণই একমাত্র কর্ত্তব্য মনে করি, এবং সময় সময় মোহান্ধ হইয়া অন্যের জীবননাশেও সমুদ্যত হই। এইরূপ স্বার্থপরতা নাদিরসাহের অভিযানসময়ে ভারতের সকল জাতির শরণ্য হইয়া উঠিয়াছিল, সেই জন্যই ভারতবাসী সেই দিন হইতে সুখ ও স্বাধীনতায় চিরতরে বঞ্চিত হইয়া আছে। এইরূপ স্বার্থে অন্ধ হইয়াই দুর্দ্ধর্ষ মহারাট্টাগণ রত্নগর্ভা মিবারভূমিতে আপতিত হয়, এবং উহার শোণিতশোষণ করিয়া সর্ব্বসংহারক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত করে; এইরূপ স্বার্থের দাস হইয়াই আততায়ী অভয়াসিংহ স্বীয় জন্মদাতার হৃদয়শোণিত

পাত করিয়া রাঠোরকুলের সর্ব্বনাশ সাধন করে, এবং দুরাচার উদো স্বীয় পিতা কুম্ভের হত্যা করে; এইরূপ স্বার্থের জন্যই সরলা বালিকা কৃষ্ণকুমারীর জীবন-প্রদীপ অকালে নির্ব্বাপিত হয়।

মোহ হইতে অহঙ্কার উৎপন্ন হয়। অহঙ্কারীর 'অহং'-ব্যতীত অন্য আর কোন জ্ঞান থাকে না। সে অন্যের দোষ-কীর্ত্তনে সুখানুভব করে, নিজের বাহ্যচাক্‌চক্যপ্রকাশে সর্ব্বদা যত্নশীল থাকে এবং নিজকেই সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্ ও ক্ষমতাশালী মনে করিয়া ক্রমে অন্যকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করে। অহঙ্কা-রীর অহঙ্কার অনেকসময়েই তদীয় বিনাশের কারণ হইয়া উঠে। এই অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্যই রাঠোরবীর রায়সিংহের বিনাশের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই অহঙ্কারের দোষে ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব স্বর্গগমনে অক্ষম হইয়াছিলেন; কেবল নিরহঙ্কার যুধিষ্ঠিরই সশরীরে স্বর্গারোহণে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। সহদেব কাহাকেও আপনার সদৃশ প্রাজ্ঞ মনে করিতেন না; নকুল আপনাকে অতুলনীয় রূপবান্ মনে করিতেন; অর্জ্জুন আপনাকে অদ্বিতীয়ধনুর্দ্ধর ভাবিয়া অপরাপর ধনুর্ধারিবৃন্দকে অবজ্ঞা এবং ভীম নিজকে সকলের অপেক্ষা বলশালী মনে করিতেন। তাঁহারা সকলেই নানাগুণে বিভূষিত থাকিয়াও কেবল অহঙ্কারের দোষে স্বর্গগমনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অহঙ্কারের হস্ত হইতে মুক্তিলাভের উপায় অন্যের সহিত নিজকে তুলনা করিয়া দেখা। "আমা হইতে শ্রেষ্ঠ কেহ নাই, আমার মত

জ্ঞানী, বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্ বা ধনী কেহ নাই" মনে এইরূপ ধারণা হওয়াই অহঙ্কারের কুকার্য্য। জগতের সহিত যাহাদের সম্বন্ধ নাই, যাহারা নিজগণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া কেবল নিকটস্থ লোকের সহিত সম্বন্ধ রাখেন, তাহাদেরই মনে এই ভাবের উদয় স্বাভাবিক; কিন্তু যাঁহারা স্বীয় গণ্ডীর মধ্যে দৃষ্টি আবদ্ধ না রাখিয়া গণ্ডীর বাহিরে লক্ষ্য করেন এবং অভ্রান্তচিত্তে নিজকে অন্যান্যব্যক্তির সহিত তুলনা করেন, তাঁহাদের অহঙ্কারের কারণ থাকিতে পারে না। ধনে, মানে ও জ্ঞানে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ অনেক ব্যক্তি রহিয়াছেন দেখিতে পাইয়া তাহাদের মোহ ভাঙ্গিয়া যা; অহঙ্কারের ভাব মনে থাকিলে তাহা খর্ব্বীভূত হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ একটু ভাবিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্টই উপলব্ধ হয় যে, ইহ সংসারে আমাদের অহঙ্কার করার কোন সামগ্রী নাই। তুমি, আমি সকলেই ভগবানের শক্তি লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছি। তোমাতে ভগবানের শক্তি যে পরিমাণে প্রকটিত হইয়াছে, আমাতে তদপেক্ষা ক্ষীণাকারে তাহা বিকশিত হইতে পারে, কিন্তু তাহা বলিয়া কি আমি তোমার অবজ্ঞার পাত্র? ভগবানের বিশ্বরাজ্যে তুমি আমি ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্রতম জীব। তোমার শক্তি অপেক্ষা শতগুণে, সহস্রগুণে শক্তিশালী ব্যক্তি রহিয়াছেন যাঁহাদের সহিত তোমার তুলনাই হয় না; তাঁহাদের নিকট তুমি সমুদ্রমধ্যে একটী বুদ্বুদ্‌মাত্র, যদি তাহাই হয়, তবে আমি তোমা অপেক্ষা কম শক্তিশালী বলিয়া তোমার অহঙ্কার করার কি রহিল?

ঘৃণা দোষণীয় হইলেও ঘৃণার্হকে ঘৃণা করা অনুচিত নহে। ঘৃণা যখন অসৎকার্য্যে প্রযুক্ত হয়, তখন ইহা সুরলোকগামিনী। যে চুরি করে, মিথ্যা বলে, ইন্দ্রিয়ের অপব্যবহার করে এবং ঈদৃশ অন্যান্য অসৎকার্য্যে রত থাকে, তাহাকে ঘৃণা করিলে তাহার উপকারেরই সম্ভাবনা; অনুতপ্ত হইয়া সে এই সমুদয় দোষণীয় কার্য্য পরিত্যাগ করিতে পারে। কিন্তু যখন ধনী অহঙ্কারে মত্ত হইয়া নির্ধনকে ঘৃণা করে, কিংবা বিদ্বান্ সগর্ব্বে মূর্খকে অবজ্ঞা করে, যখন জাত্যভিমানে একজাতি অন্য জাতিকে ঘৃণা করে, তখন ঘৃণা নিরয়গামিনী। এইরূপ ঘৃণা মানুষকে সহানুভূতি হইতে বিচ্যুত করে।

ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা এই দুইটীর বলে রাজপুতবীরগণ কিঞ্চিদূন দ্বিসহস্রবৎসর আপনাদের স্বাধীনতা ও গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। পারদ, ভীল, তুর্কি ও তাতার প্রভৃতি অসভ্যজাতিদ্বারা বারংবার উপদ্রুত ও বিড়ম্বিত হইয়াও তাঁহারা মুহূর্ত্তের জন্য চঞ্চল হন নাই। প্রচণ্ড প্রচণ্ড বিপ্লবঝটিকা রাজপুতজাতির ভিন্ন ভিন্ন শাখা-প্রশাখাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল সত্য, কিন্তু তাঁহারা ধৈর্য্য-স্তম্ভ ধরিয়া সেই সমস্ত শাখা-প্রশাখাকে পুনর্ব্বার মুকুলিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। যদি অন্যান্য জাতির ন্যায় তাঁহারাও অস্থির হইয়া ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম করিতেন, তাহা হইলে, রাজপুতবংশতরুর অনেক শাখা-প্রশাখা চিরতরে লুপ্ত হইয়া যাইত, এবং হয়ত তাঁহাদের গৌরবও এত দীর্ঘকাল স্থায়ী হইত না। ফলতঃ চঞ্চলপ্রকৃতির লোক দ্বারা কোন কার্য্য সুসিদ্ধ হয় না; কোন কার্য্য করিয়া যদি

অচিরে সুফল দেখিতে না পায়, ইহারা হতাশ হইয়া পড়ে; তাহাদের উদ্যম ও অধ্যবসায় একবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। একবারমাত্র বিফলমনোরথ হইয়াই তাহারা "হা হতোঽস্মি" বলিয়া উপায়ান্তর উদ্ভাবনে নিশ্চেষ্ট থাকে। কেহ কেহ আবার প্রথমেই ফলে সন্দিহান হইয়া কর্ম্ম হইতে বিরত হয়, এবং ক্রমে পরাচীন হইয়া পড়ে। কিন্তু স্থিরপ্রকৃতির লোক যে কার্য্য সম্পাদনের জন্য অগ্রসর হন, তাহার ফল না দেখিয়া কখনই সেই কার্য্য হইতে বিরত হন না; তাঁহাদের কর্ম্মে শতসহস্র অন্তরায় উপস্থিত হইলেও তাঁহারা নিরাকৃত হন না বরং আরও অধিক উদ্যম ও অধ্যবসায়ের সহিত বিঘ্ন-সমূহকে দূর করিতে যত্ন করেন।

ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার বলে প্রহ্লাদ আরাধ্য দেবতাকে পাইয়া হৃদয়ের শান্তিবিধান করিয়াছিলেন; মায়াদেবীসুত নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং ধ্রুব সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন। ধৈর্য্যবলে হুমায়ুন রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াও আবার ভারত-সিংহাসনে অধিষ্ঠান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হুমায়ুন সের সাহ কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইয়া দুর্দ্ধর্ষ বৈরীর করালগ্রাস হইতে রক্ষা পাইবার জন্য যে স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন, নিষ্ঠুর সের সাহ সেইখানেই তাঁহাকে আক্রমণ করিতেন। অবশেষে নিরুপায় হইয়া তিনি অমরকোটাভিমুখে পলায়ন করেন; পথে যেরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হন, তাহাতে যদি মুহূর্ত্তের জন্যও অধীর হইতেন, তাহা হইলে সপরিবারে পথেই বিনষ্ট হইতেন; কিন্তু হুমায়ুন একমাত্র ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতাবলে সেই ভয়াবহ বিপৎসাগর উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন।

দয়াগুণ।

যে সমস্ত গুণগ্রামের জন্য মানুষ প্রাণিজগতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে, তন্মধ্যে দয়া একটী অতি উৎকৃষ্ট গুণ। যে সকল ধর্ম্মবীর জগতে প্রেমের রাজ্য বিস্তার করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের সকলেরই এই গুণ সম্যক্‌রূপে বিদ্যমান ছিল। বুদ্ধদেবে ও চৈতন্যদেবে এই গুণ সম্যক্ পরিস্ফুটিত হইয়াছিল, তাহাতেই তাঁহারা নিজকে ভুলিয়া জগজ্জনকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, নিজের দুঃখ ভুলিয়া পরের দুঃখমোচনে জীবনপণ করিয়া জগতে প্রেমের রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। হৃদয়ে যখন এই গুণ সম্যক্‌রূপে বিকশিত হয়, তখন আর আত্মপর জ্ঞান থাকে না।

দয়াকে প্রধানতঃ দুই অঙ্গে বিভক্ত করা যাইতে পারে; (১) দান (২) সহানুভূতি। দান অনেকপ্রকারের হইতে পারে। এক কালে বহু অর্থ দেওয়ার নামও দান। কিন্তু এইরূপ দান করা অনেকেরই সাধ্য নহে। অথচ ইহা অনেকসময় স্বার্থজড়িত থাকে। যাহা ধনী নির্ধন সকলেরই আয়ত্ত আমরা সেইরূপ দানের কথাই বলিতেছি। অত্রিসংহিতায় এইরূপ দানের সংজ্ঞানির্দ্দেশ রহিয়াছে।

অহন্যহনি দাতব্যমদীনেনান্তরাত্মনা।
স্তোকাদপি প্রযত্নেন দানমিত্যভিধীয়তে॥

"অল্প আয় হইলেও তাহা হইতে প্রতিদিবস অক্ষুব্ধচিত্তে কিঞ্চিৎ দেওয়ার নাম দান।" দান অতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম; যে সকল দীনদুঃখী হা অন্ন! হা অন্ন! বলিয়া একমুষ্টি ভিক্ষার জন্য পথে পথে অনবরত চিৎকার করিয়া বেড়ায়, একমুষ্টি চাউল অথবা একটী পয়সা দিয়া তাহাদের সাহায্য করা আমাদের সকলেরই অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম। কিন্তু দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া দান করা উচিত। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে লিখিত আছে যে, যাহারা অপাত্রে দান করে, তাহারা আত্মাকে ব্রহ্মহত্যা-দোষে দূষিত করে। ইহা বড়ই উচ্চদরের কথা এবং ইহার গূঢ়ার্থ বুঝিতে হইলে, "অপাত্র" কে, তাহাই পূর্ব্বে নির্ণয় করিতে হইবে। কর্ম্ম করিবার শক্তি আছে, কিন্তু সেই শক্তি যথাস্থানে প্রয়োগ না করিয়া যে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে, এইস্থলে তাহাকেই অপাত্র বলা হইয়াছে। এইরূপ ব্যক্তিকে দান করা অতীব অনিষ্টদায়ক। এইরূপ দানে দাতা ও গ্রহীতার অমঙ্গল হয়। ইহা দাতার ধননাশ ও গ্রহীতার আলস্য বৃদ্ধি করে। অলসতা নানা দোষের আকর। আত্মনির্ভরে সমর্থ ব্যক্তিকে দান করিয়া অলসতার প্রশ্রয় দেওয়া কাহারও উচিত নহে। এইরূপ অলসতার প্রশ্রয় দিয়া আমরা দেশের ঘোর অনিষ্টসাধন করিতেছি। অসঙ্গত দানই আমাদের দেশে ভিক্ষুকাধিক্যের প্রধান কারণ; এবং আমরা এইরূপ দান করি বলিয়াই, আত্মোদরপূরণে সক্ষম ব্যক্তিও ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে। যাহারা বধির, খঞ্জ বা ঈদৃশ কোন অঙ্গহীন, অথবা যাহারা বৃদ্ধ এবং যাহাদের জীবিকা-

নির্ব্বাহের অন্য কোন উপায় নাই তাহাদিগকেই, যথাসাধ্য দান করা উচিত। এইরূপ দানই সহজ ও স্বাভাবিক এবং এইরূপ দান হইতে হৃদয়ের কোমলবৃত্তিগুলি ক্রমে বিকশিত হইয়া অবশেষে মানুষকে দেশসেবায়, প্রাণিসেবায় নিয়োজিত করে। কিন্তু যাহারা কার্য্যক্ষম, নিজে কর্ম্ম করিয়া নিজের ও পরিবারস্থ লোকের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করিবার যাহাদের ক্ষমতা ও শক্তি রহিয়াছে, তাহাদিগকে দান করা কোনমতেই বিধেয় নহে। দুঃখের বিষয়, আমাদের সমাজে অনেক কার্য্যক্ষম ব্যক্তিও ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া স্বচ্ছন্দে জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকে। আমাদের সমাজের শাসন নাই বলিয়াই এরূপ আত্মনির্ভরে সক্ষম ব্যক্তিও নীচবৃত্তি অবলম্বন করে। যশোলাভের কিংবা প্রত্যুপকারের আশায় দান করা উচিত নহে; এইরূপ দানকে রাজসিক দান বলে। অনুপযুক্তপাত্রে যে দান, তাহার নাম তামসিক দান। দেয়জ্ঞানে দেশ, কাল ও পাত্র অনুসারে দান করা উচিত; এইরূপ দানই শ্রেষ্ঠ, ইহাই সাত্বিক দান এবং এইরূপ দানেই দয়ার রাজ্য বিস্তার লাভ করে। কীদৃশলোককে দান করা উচিত, তাহার সম্যক্ নির্দ্ধারণ করিবার কোন উপায় নাই। সময় ও অবস্থা বিবেচনায় ইহা নিজে নিজেই স্থির করিতে হয়।

সহানুভূতি উচ্চ-অঙ্গের দয়া। অন্যের দুঃখে দুঃখী ও অন্যের সুখে সুখী হওয়া, পরশুশ্রূষা ও পরহিতে ব্রতী হওয়া ইত্যাদি সহানুভূতির কার্য্য। পুরাণে লিখিত আছে, মানুষ চতুর্ব্বিধ ঋণে ঋণী হইয়া এই ধরাধামে জন্মগ্রহণ করে। সুযোগ

উপস্থিত হইলে যে ব্যক্তি এই সকল ঋণ পরিশোধ করিতে যত্ন না করে, তাহার কখনও শ্রেয়োলাভ হয় না। উক্ত চতুর্ব্বিধ ঋণের মধ্যে মানব-ঋণ অন্যতম। সহানুভূতিদ্বারা এই মানব-ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। সুতরাং মনুষ্যজাতির প্রতি দয়া প্রকাশ করিতে আমরা বাধ্য। এমন কি, যাহারা দু'দিন পূর্ব্বে আমাদের অহিতে রত ছিল এবং আমাদিগকে দেখিবা মাত্র যাহাদের হৃদয় হিংসা ও দ্বেষে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত তাহাদিগকেও, দয়া করিতে আমরা ধর্ম্মতঃ বাধ্য। কেবল মনুষ্য কেন, প্রাণি-মাত্রই আমাদের দয়ার পাত্র। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরে এই দয়াগুণ সম্যক্‌রূপে পরিস্ফুরিত হইয়াছিল। পরোপকার তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল এবং সেই ব্রতের উদ্‌যাপন করিয়া তিনি এই সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। বিদ্যাসাগরের দয়া কতশত অন্নক্লিষ্টদরিদ্রের দুঃখমোচন করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই অথচ কেহ তাহা জানিতে পারে নাই। বিদ্যাসাগর যথার্থ "দয়ার সাগর" ছিলেন। দরিদ্রের দুঃখকষ্ট দেখিলে চক্ষের জলে তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যাইত; তিনি বালকের ন্যায় চিৎকার করিয়া কাঁদিতেন। তাঁহার উপার্জ্জনের প্রায় সমস্ত অর্থ তিনি দরিদ্রদিগের দুঃখমোচনে ব্যয়িত করিয়াছেন। ছিয়াত্ত-রের মন্বন্তরের সময় বিদ্যাসাগরের কৃপায় বীরসিংহ ও তন্নিকটস্থ গ্রামসমূহের নরনারী একটী দিনের জন্যও উপবাস করে নাই। বর্দ্ধমানের সেই প্রসিদ্ধমারীভয়ের সময় বিদ্যাসাগরের কৃপায় অনেক নরনারী মৃত্যুর করালগ্রাস হইতে রক্ষা পায়। তিনি

নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া, নিজের জীবন তুচ্ছ ভাবিয়া ঔষধ ও পথ্যাদি লইয়া স্বয়ং মুমূর্ষুর ঘরে ঘরে বেড়াইয়াছেন, তাহাদের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া যামিনীযাপন করিয়াছেন। স্বদেশবাসিগণের দুঃখ দূর করিতে, দরিদ্রের অভাব ঘুচাইতে, এবং আর্ত্ত ও বিপন্নজনের সাহায্য করিতে তিনি জীবনের শেষ দিনপর্য্যন্ত কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত ছিলেন; তাঁহার স্বার্থসিদ্ধি বা সুনামলাভের আকাঙ্ক্ষা ছিল না। তিনি যাহাদের উপকার করিয়াছেন, অনেকসময় তাহাদের দ্বারাই বিড়ম্বিত ও লাঞ্ছিত হইয়াছেন; কিন্তু তাহাতে তাঁহার হৃদয়ের মহত্ত্ব ও কোমলতা বিনষ্ট হয় নাই; সমবেদনাপ্রদর্শনের একটুও ব্যাঘাত ঘটে নাই। সেই বিশ্বজনীন প্রেম ভরা নদীর ন্যায় খরতর-বেগে ধাবিত হইয়া পরে পশুপক্ষীতেও বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। দুঃখীর দুঃখ দেখিলে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবেরও হৃদয় কাঁদিয়া উঠিত। তিনি তাহাদের দুঃখমোচনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতেন। একদিবস পরমহংসদেব রাণী রাসমণির জামাতা মথুরানাথ বিশ্বাসের সহিত জলবায়ুসেবনোদ্দেশ্যে নৌকায় পরিভ্রমণ করিতে করিতে মথুরবাবুর জমিদারীর অন্তর্গত কলাই-ঘাটানামক গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইলেন। নৌকা তীরে লাগিবা মাত্র অসংখ্য নরনারী তাঁহাকে দেখিবার জন্য তীরে আসিয়া একত্রিত হইল। লোকগুলি জীর্ণশীর্ণ ও কঙ্কালসার; দেখিলে বোধ হয় যেন তাহারা বহুকালাবধি অনশনে বা অর্দ্ধাশনে দিন যাপন করিতেছে। পরমহংসদেব ইহাদের এই

শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া অল্পবয়স্কবালকের মত কাঁদিতে লাগিলেন এবং মথুরবাবুকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"মথুর" ! ইহাদের এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া আমার প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে। তুমি ইহাদিগকে উপযুক্তপরিমাণে 'খাবার' এবং প্রত্যেককে একখানা করিয়া পরিধানের বস্ত্র দেও। ইহারাও মায়ের সন্তান ; মার এমন ইচ্ছা নহে যে তাঁহার কোন সন্তান অন্নাভাবে মারা যাবে।" বলা বাহুল্য যে, মথুরবাবু পরমহংসদেবের আদেশে ইহাদিগকে পরিতোষসহকারে আহার করান এবং প্রত্যেককে একখানা করিয়া পরিধানের বস্ত্র দান করেন।

"সহানুভূতি" ভালবাসা হইতে উৎপন্ন হয়। এই ভালবাসার ক্ষেত্র বিস্তৃত হইলেই মানুষ নিজের সুখ ভুলিয়া পরার্থে নিজের স্বার্থ উৎসর্গ করে, পরের হিতের জন্য নিজের জীবন বিসর্জ্জন করে। ইহাই আত্মত্যাগের চরম দৃষ্টান্ত। ভালবাসা প্রথমতঃ পরিবারস্থ লোকের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে। আমরা পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা প্রভৃতিকেই ভালবাসিতে আরম্ভ করি। পরিবারই আমাদের ভালবাসার প্রাথমিক শিক্ষাস্থল ; পরে আমরা যত অধিকপরিমাণে ইহার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হই, ইহাও ততই বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ক্রমে গ্রামস্থ ও নগরস্থ এমন কি মনুষ্যমাত্রের উপর, এবং সর্ব্বশেষে প্রাণিমাত্রের উপর ইহা নিবিষ্ট হয়।

চিত্রাণী ও চিত্রবাণী নামে গন্ধর্ব্বরাজ মাল্যবানের দুই পত্নী ছিলেন। একদা গন্ধর্ব্বরাজ পত্নীদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া উদ্যানভ্রমণ

করিতেছেন এমনসময়, একটী পক্ষিশাবক শাখাভ্রষ্টহইয়া ভূমি-তলে পতিত হইল। রাজপত্নীদ্বয় শাবকটীর নিকটে গিয়া দেখিলেন যে, তাহার একখানি পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তাঁহারা শুশ্রূষার জন্য শাবকটীকে গৃহে লইয়া চলিলেন কিন্তু পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া দেখিলেন, শাবকজননী স্বীয় শাবকের মায়া ছিন্ন করিতে অক্ষম হইয়া তাহাদের অনুসরণ করিতেছে। ইহা দেখিয়া তাঁহাদের কোমল হৃদয় গলিয়া গেল; তাহারা আর গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন না; সেই বৃক্ষতলে একটী লতামণ্ডপ প্রস্তুত করিয়া ইহাতে শাবকটীকে রাখিলেন এবং যথাবিধানে তাহার শুশ্রূষা করিতে আরম্ভ করিলেন। শুশ্রূষার বলে শাবকটী অল্পদিনেই আরোগ্য লাভ করিল। শূদ্র তপস্বী পশুপত এক দিবস গঙ্গাস্নানে গিয়া দেখেন যে, দুইটী পক্ষিশাবক জলে ভাসিয়া যাইতেছে। তিনি সেই দুইটী শাবককে জল হইতে উঠাইয়া ইহাদের লালনপালন করেন এবং নিজগৃহে তাহাদের বাসা নির্ম্মাণ করিয়া দেন। রাজা উশীনর শ্যেনকে কপোতের বিনিময়ে নিজদেহ অর্পণ করিয়াছিলেন। গন্ধর্ব্বপত্নীদ্বয়ে, রাজা উশীনরে এবং শূদ্রতপস্বী পশুপতে দয়াগুণের পূর্ণবিকাশ হইয়াছিল। তাঁহা-দের দয়া কেবল মনুষ্যজাতির মধ্যে আবদ্ধ ছিল না; প্রাণিমাত্রের উপর বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। ভালবাসার ক্ষেত্র যত প্রশস্ত হইবে, আত্মত্যাগের ক্ষেত্রও ততই বিস্তৃত হইবে। যতদিন ভাল-বাসা পরিবারের মধ্যে আবদ্ধ থাকে, তত কাল আত্মত্যাগের ক্ষেত্রও পরিবারমধ্যেই আবদ্ধ থাকে; কিন্তু যখন ইহার পরিসর

ভিন্নপরিবারপর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে, তখন ভিন্নপরিবারস্থ লোকের জন্যও আমরা আত্মবিসর্জ্জনে প্রস্তুত হই। এইরূপে যখন স্বদেশের তাবৎ লোকের উপর ভালবাসার পরিসর বিস্তার লাভ করে, তখন স্বদেশের জন্য আমরা আত্মত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হই। এইরূপ আত্মত্যাগই স্বদেশপ্রেমের পূর্ণবিকাশ। তখন ব্যক্তিবিশেষের প্রতি বা পরিবারস্থলোকের প্রতি যে বিশিষ্ট ভালবাসা তাহা আর থাকে না; স্বদেশপ্রেমের নিকট ইহা অতি তুচ্ছ বলিয়া অনুমিত হয়; তখন স্বদেশের জন্য আমরা সমস্ত ত্যাগ করিতে প্রস্তুত হই। এই জন্যই মিবরাধিপতি রাণা ভীমসিংহ প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর পুত্রগণকেও স্বদেশের মঙ্গলার্থে বলিদান করিয়াছিলেন। রাণা ভীমসিংহ যবনশিবির হইতে মুক্তিলাভ করিয়া এক দিবস শ্রান্তি দূর করিবার মানসে নিজপ্রকোষ্ঠে শয়িতাবস্থায় মিবারের ভবিষ্যচিন্তায় নিমগ্ন আছেন এমনসময়, হঠাৎ "মৈ ভূখাহুঁ" এই শব্দটী তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। যে দিক্ দিয়া শব্দ আসিল, রাণা সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া চিতোরের অধিষ্ঠাত্রীদেবীকে দেখিতে পাইলেন। ভগবতীকে দেখিবামাত্র ভীমসিংহ বলিলেন, "আট সহস্র বীরপুরুষ খাইয়াও কি তোমার ক্ষুধার নিবৃত্তি হইল না মা"! দেবী কহিলেন—"আমি রাজবলি চাই; রাজমুকুটধারী দ্বাদশরাজকুমারকে বলিরূপে প্রাপ্ত না হইলে মিবাররাজ্য শিশোদীয়কুলের হস্তচ্যুত হইবে।" এই বলিয়াই দেবী অন্তর্হিতা হইলেন। পরদিবস রাণা ভীমসিংহ পারিষদবর্গকে এই কথা জানাইয়া 'দ্বাদশবলির'

আয়োজন করিলেন। ভীমসিংহের দ্বাদশপুত্রের মধ্যে একাদশ জনই আত্মোৎসর্গের জ্বলন্তদৃষ্টান্ত দেখাইয়া যবনসমরে জীবন-বিসর্জ্জন করিলেন। অজয়সিংহ রাণার অতি স্নেহপাত্র ছিলেন; তিনি অজয়সিংহকে রণক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে না দিয়া আত্ম-হৃদয়ের শোণিতদানে দেবীর পিপাসার শান্তিবিধান করিলেন।

আত্মত্যাগের প্রসাদে জগতে অনেক সদনুষ্ঠান সিদ্ধ হইয়াছে। এই আত্মত্যাগের প্রসাদে ১৫৭২ অব্দের "তিজ" মহোৎসবের দিন একশত চল্লিশ জন রাজপুতমহিলার সতীত্ব-রক্ষা হইয়াছিল। রাঠোরকুলতিলক যোধরাওয়ের তনয় সুরজ-মল নিজহৃদয়ের শোণিতবিনিময়ে এই রাজপুতমহিলাদিগকে আততায়িগণের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া জগতে অক্ষয়কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন।

কপটতা।

কোন বস্তুর সংজ্ঞানির্দ্দেশ করিতে হইলে সেই বস্তুর প্রকৃতিগত গুণাগুণ তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিতে হয়। কপট-শব্দেরও সংজ্ঞানির্দ্দেশ করিতে হইলে কপট কাহাকে বলে, তাহাই পূর্ব্বে উল্লেখ করিতে হইবে; কপটের প্রকৃতিগত গুণাগুণ দেখিতে হইবে। যে বাক্যে বিনয় প্রদর্শন করে, কিন্তু হৃদয় ক্রূরতায় পূর্ণ, যে নিষ্ঠুরকার্য্য করিতে মানস করিয়া হাস্য করে, বাহ্যিকসদ্ভাব দেখাইয়া অনিষ্টসাধনের চেষ্টা করে তাহাকেই কপট বলা হয়। কপটের বাহ্যিক আকার সরলতাপূর্ণ কিন্তু হৃদয় তীক্ষ্ণধারক্ষুরসদৃশ। তাহার অন্তর সয়তানের ক্রীড়া-ভূমি, কিন্তু বাহিরে সে একজন তিলক-কাটা পরম বৈষ্ণব। তাহার বচন কুর্ম্মের গ্রীবার ন্যায়, বাহিরে ভিতরে উভয়দিকে সঞ্চালিত হয়। সাধারণতঃ যেরূপ বাহ্যভাবভঙ্গিতে আন্তরিক ভাব প্রকাশ হইয়া পড়ে ইহার সেরূপ হয় না; বরং তাহার বিপরীত দৃষ্ট হইয়া থাকে। কপটলোককর্ত্তৃক সমাজের যেরূপ অনিষ্ট সাধিত হয়, জগতে আর কাহারও দ্বারা সেরূপ হয় না। ইহারা সমাজের ও দেশের ঘোরশত্রু। অলক্ষিতভাবে থাকিয়া ইহারা অভিপ্রেতব্যক্তির প্রতি অতি সহজে হিংসারূপ তীক্ষ্ণাস্ত্র নিক্ষেপ করে অথচ তাহার লক্ষ্যব্যক্তি কিছুই বুঝিতে পারে না।

পরশ্রীকাতরতা ও হিংসার সহিত লৌকিকতার সম্মিলন কপটতার প্রধান ও মৌলিক কারণ। যাহারা অন্যের উন্নতি ও

অভ্যুদয় দেখিলে ঈর্ষ্যাপরবশ হয়, আমরা তাহাদিগকেই পরশ্রী-কাতর বলি। পরশ্রীকাতরতা দুর্ব্বলতা বা অক্ষমতা হইতে উৎপন্ন হয়। যাহারা সক্ষম ও উদারচেতা, তাহারা অন্যের উন্নতি দেখিলে নিজক্ষমতাবলে তদনুরূপ বা ততোঽধিক আত্মোন্নতি সাধন করেন; কিন্তু যাহারা অক্ষম অথবা নিজকে অক্ষম বলিয়া মনে করে প্রত্যুত নীচমনা, তাহারা আত্মোন্নতির কোন চেষ্টা না করিয়া হিংসায় হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া রাখে এবং উদ্যম-শীল লোকের অনিষ্টসাধনে প্রবৃত্ত হয়। আদর্শকে খর্ব্ব করিয়া নিজে বড় হওয়ার চেষ্টা করা অতিশয়ঘৃণিতকার্য্য; তাহাতে নিজের ও জাতীয়জীবনের অধোগতি ঘটে; পক্ষান্তরে আদর্শের সমকক্ষ হওয়ার প্রয়াস আত্মোন্নতির ও জাতীয়-উন্নতির প্রকৃষ্ট পন্থা। গুণগ্রামের সংগ্রামে জয়ী হওয়াই পুরুষার্থ; তাহাতে একদিকে যেমন নিজের বীরত্ব প্রকাশ পায়, অন্যদিকে সেইরূপ জাতীয়-উন্নতির পথ প্রশস্ততর হইয়া উঠে।

পরশ্রীকাতরতা অশেষ অনিষ্টের মূল। সুচিন্তাশীল ৺ কালী-প্রসন্ন ঘোষ যথার্থই বলিয়াছেন, "ইহা দূরসম্পর্কিত অপেক্ষা নিকট-সম্পর্কিতকে, যথার্থপর অপেক্ষা মন গড়া পর আপনারজনকেই বরং অধিক স্পর্শ করে।" প্রায়ই দৃষ্ট হয়, যখন কেহ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে থাকেন, তখনই তাহার চতুর্দ্দিকস্থ হীনচেতা লোক তাঁহার প্রতি দ্বেষ ও হিংসা করিতে আরম্ভ করে; তদীয় উন্নতির পথে বাধাদিতে গিয়া অতিশয় ঘৃণণীয় কার্য্যের অনুষ্ঠান করে এবং যথাতথা তাঁহার নিন্দা করিয়া আত্মগৌরব বিস্তার

করার চেষ্টা করে। যে অন্যের নিন্দা দ্বারা আপনার গৌরব বৃদ্ধি করিতে প্রয়াস পায়, সে স্বহস্তে তাহার অবনতির পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়। আত্মশ্লাঘা দ্বারা কখনই গৌরববৃদ্ধি হয় না; বরং ইহা হইতে গৌরব নষ্ট হয়। গুণবান্ ব্যক্তি কখনই আত্মশ্লাঘা করেন না। তিনি সুশীতলচন্দ্র ও সুগন্ধি প্রসূনের ন্যায় আত্মশ্লাঘা না করিয়া স্বকীয় যশঃসৌরভে চতুর্দ্দিক্ আমোদিত করেন।

অন্যের উন্নতি দেখিয়া কখনও ঈর্ষাপরবশ হওয়া উচিত নহে। ঈর্ষার বশে অন্ধ হইয়া যে কাপুরুষ অন্যের অনিষ্টসাধনে বড় হইতে আকাঙ্ক্ষা করে, সে নিজের সৌভাগ্যপথে নিজেই কণ্টক রোপণ এবং স্বদেশকেও কলঙ্কিত করে। দুর্বৃত্ত কাপুরুষ জয়চাঁদ স্বীয় ভ্রাতা পৃথ্বীরাজের উন্নতি দেখিয়া এই দুষ্প্রবৃত্তির বশে পুণ্যময়ী ভারতভূমিকে চিরদিনের জন্য অধীনতাশৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত করিয়া গিয়াছে। কুলপাংসন জয়চাঁদ এই ঈর্ষার বশীভূত হইয়া দেশশত্রু সাহাবুদ্দিনের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া স্বদেশভক্ত পৃথ্বীরাজ ও সমরকেশরী সমরসিংহের শোণিতে ভারতভূমিকে অভিষিক্ত করিয়াছিল। কেবল যে পৃথ্বীরাজ ও সমরসিংহের শোণিতপাতেই ইহা পর্য্যবসিত হইয়াছিল এমন নহে; ইহার চরমফল পরশ্রীকাতর জয়চাঁদের রাজ্যচ্যুতি ও গঙ্গাবক্ষে প্রাণ-বিসর্জ্জন। পৃথ্বীরাজ ও সমরসিংহের পতনের কিছুদিন পরেই সাহাবুদ্দিন জয়চাঁদের রাজ্য আক্রমণ করেন। নৃশংস জয়চাঁদ প্রাণ লইয়া নৌকারোহণে পলায়ন করে, কিন্তু তরণী গঙ্গাসলিলে মগ্ন হইয়া তাহার পাপপিপাসার চিরনিবৃত্তি সাধন করে।

পরশ্রীকাতর লোক কখনও নিজের জীবনে সুখানুভব করিতে পারে না। যাহাতে অন্যের মনে সুখ হয়, তাহার মনে তাহাতে দুঃখ হয়; অন্যের সুখ্যাতি শুনিলে তাহার হৃদয় যন্ত্রণায় কাতর হইয়া পড়ে। সে কুসুমে কীট ভিন্ন আর কিছু দেখে না। সুধা তাহার নিকট বিষ এবং স্বর্গ তাহার নিকট নরক। বিশ্বজনীন ভালবাসা পরশ্রীকাতরতার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায়। আমরা যাহাকে প্রাণ ভরিয়া ভালবাসি, তাহার শ্রীবৃদ্ধি দেখিলে কখনই ঈর্ষান্বিত হই না। পিতা পুত্রের উন্নতি দেখিলে কখনও ঈর্ষাপরবশ হন না; ইহার কারণ, পুত্রের প্রতি পিতার অগাধ ও অকৃত্রিম ভালবাসা। যদি এই ভালবাসা কেবল নিজের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের মধ্যে নিবদ্ধ না থাকিয়া আপামর সর্ব্বসাধারণলোকের উন্নতি ও অভ্যুদয়ে প্রধাবিত হয় তাহা হইলে, আমাদের ঈর্ষান্বিত হওয়ার কোনই কারণ থাকিবে না।

পরশ্রীকাতরতা অশেষ দোষের আকর; কিন্তু যখন ইহা লৌকিকতার আবরণে আচ্ছাদিত হইয়া সমাজে প্রবেশলাভ করে তখন, ইহার অনিষ্টকারিতা শতগুণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। পরশ্রীকাতর লোক যখন দেখিতে পায় যে তাহার অভিপ্রেতব্যক্তি তদপেক্ষা বলবান্, প্রকাশ্যভাবে শত্রুতা করিয়া সে তাহার কোন অনিষ্টসাধন করিতে পারিবে না, তখন সে খলতা অবলম্বনপূর্ব্বক তাহার অনিষ্টসাধনে রত হয়। সে তাহার অভিপ্রেত ব্যক্তির সহিত বাহ্যিকসৌহার্দ্দ্য স্থাপন করিয়া মিষ্টকথায় তাহাকে তুষ্ট করিবার চেষ্টা করে। সম্মুখে শতমুখে তাহার প্রশংসা করে

এবং তাহার সহিত সর্ব্বপ্রকার সামাজিকতা রক্ষা করিয়া চলিতে থাকে; কিন্তু গোপনে গোপনে তাহার অনিষ্টসাধনে নিরত থাকে।

লৌকিকতা রক্ষা করা দোষের কার্য্য নহে; বরং ইহা রক্ষা করাই বাঞ্ছনীয়। মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে গেলে লোকের সহিত সদ্ভাবসংস্থাপন করা সকলেরই কর্ত্তব্য। লৌকিকতা রক্ষা সদ্ভাবস্থাপনের একটী উৎকৃষ্ট উপায়। শ্রদ্ধেয়কে শ্রদ্ধা করা, ছোটকে ভালবাসা, অতিথি-অভ্যাগতের যথেষ্ট সম্মান ও অভ্যর্থনা করা, ছোটলোককে দুইটা মিষ্টকথা বলা; সকলের প্রতি নম্রব্যবহার করা, কাহারও প্রতি কর্কশবাক্য প্রয়োগ না করা ইত্যাদি শিষ্টাচার বা লৌকিকতার কার্য্য। শিষ্টাচার ভদ্রতার পরিচায়ক। শিষ্টাচারী লোক সংসারে সুখে জীবন-যাপন করিতে পারেন। যিনি মিষ্টকথায় লোককে তুষ্ট করিতে পারেন, যিনি কাহাকেও কটূক্তি করেন না, যে কথায় অন্যের মনে ব্যথা হয় এরূপ কথা মুখ হইতে উচ্চারণ করেন না, বা "অনবধানতা বশতঃ" কখনও উচ্চারণ করিলে তৎক্ষণাৎ তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন, তিনি সকলেরই প্রিয়পাত্র হয়েন এবং সকলের সহিত মিলিয়া মিশিয়া জীবন অতিবাহিত করিতে পারেন। বস্তুতঃ মিষ্টকথায় শত্রুও বশীভূত হয়। প্রজ্বলিতপাবক যেরূপ সলিল-সংস্পর্শে নির্ব্বাপিত হয়, মিষ্টকথায় অন্যের ক্রোধও সেইরূপ নির্ব্বাপিত হয়। কিন্তু যিনি কর্কশভাষী, তিনি পদে পদে অন্য-দ্বারা লাঞ্ছিত হন। কেহই তাহাকে ভালবাসে না, কেহই তাহাকে

আশ্রয় দেয় না; তাহার ঘোর বিপদ্ ঘটিলেও কেহ তাহাকে কোনরূপ সাহায্য করিতে অগ্রসর হয় না। অগাধসলিলে নৌকা নিমগ্ন হইলে আরোহী যেরূপ আশ্রয়লাভের প্রত্যাশা করে, কিন্তু জলতরঙ্গ ব্যতীত অন্য কোনও আশ্রয় পায় না, সেইরূপ কর্কশভাষীর বিপদ্ ঘটিলে সে ইহসংসারে কোনও রূপ আশ্রয়লাভে সক্ষম হয় না। সুতরাং সংসারে সুখস্বাচ্ছন্দ্যে বাস করিতে ইচ্ছা করিলে শিষ্টাচার অবলম্বন করা একান্তকর্ত্তব্য; কিন্তু শিষ্টাচারের সঙ্গে যেন হিংসা বা ঈর্ষ্যা জড়িত না থাকে। শিষ্টাচারের সঙ্গে হিংসা বা ঈর্ষ্যা জড়িত হইলেই তাহা কপটতায় পরিণত হয়। কপটতামূলে যদিও কখন কখন নিজের স্বার্থসিদ্ধি ঘটে কিন্তু যখনই কপটতা ধরা পড়ে, তখনই কপটী সকলের ঘৃণার পাত্র হইয়া পড়ে। তাহাকে কেহ ভালচক্ষে দেখে না; তাহার সহিত মিলিয়া মিশিয়া দুইটা কথা কহিতেও কেহ প্রস্তুত হয় না। কপট ব্যক্তি তখন সমাজের বহির্ভূত হইয়া পড়ে। স্বাপদসঙ্কুল মহারণ্যে সহায়হীনব্যক্তির যেরূপ অবস্থা ঘটে, তদীয় অবস্থাও তখন ঠিক সেইরূপ হইয়া দাঁড়ায়।

কপটতা সংক্রামক রোগবিশেষ। সমাজের মধ্যে দুই চারি জনে এই রোগ জন্মিলে তাহা ক্রমে বিস্তার লাভ করিয়া সমাজের অধিকাংশ লোককেই আক্রমণ করে এবং ক্রমে কপটতা একটা জাতিগত ধর্ম্ম হইয়া পড়ে। কপটতা জাতিগত ধর্ম্ম হইয়া পড়িলে সেই জাতির শীঘ্রই অধঃপতন হয়। রণগুরু শিবাজি কপটতা অবলম্বনপূর্ব্বক অনেক যুদ্ধ জয় করেন, কিন্তু এই কপটতাই

পশ্চাৎ মহারাষ্ট্রজাতির অধঃপতনের কারণ হইয়াছিল। মোগল-সম্রাট্ অরঙ্গজীবের কপটতাই পশ্চাৎ মোগলসাম্রাজ্যের অধঃ-পতনের অন্যতম কারণ হইয়া উঠে। ব্যক্তিগত অথবা জাতিগত যে কোন উন্নতির আকাঙ্ক্ষা করিলে কপটতা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

সমাপ্ত